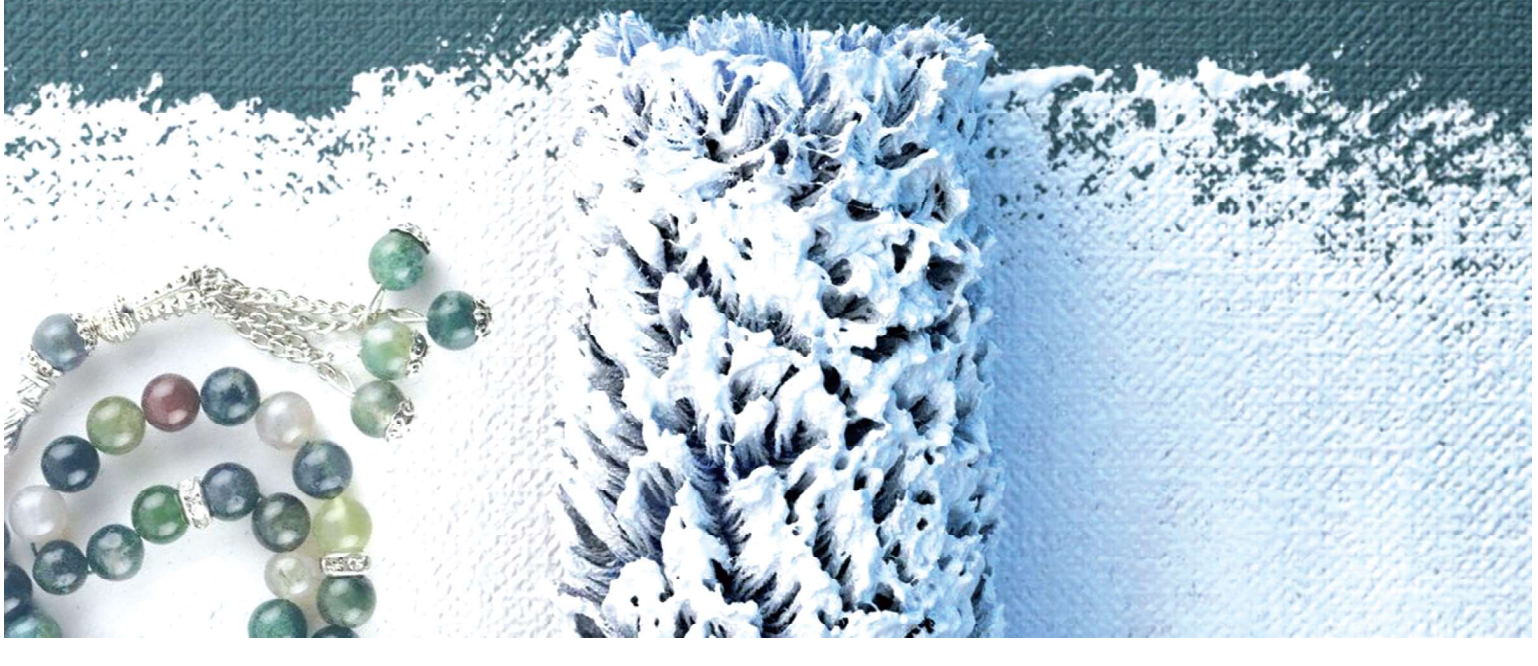
বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

অক্টোবর ◆ ২০২৪



বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ১০ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৪ ♦ আশ্বিণ-কার্তিক ১৪৩১ ♦ রবী. আউ.-রবী.সানী ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সীরাত
জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ০৬

আউলিয়া
বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.)/আব্দুল্লাহ যোবায়ের ০৮

প্রবন্ধ
গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলামপন্থি দল/মারজান আহমদ চৌধুরী ১১
নতুন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থা/মুহাম্মাদ আল জাওয়াহির খান ১৩
রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাঙ্গালি মুসলমান/সায়ীদ মানছুর ১৫
বহুবিবাহ : সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ইসলামী পরিপ্রেক্ষণ/মহসিন আহমদ ১৮
২০২৪ সালে বোরকা পরিধান : আধুনিকতা ও পশ্চাদগামিতা/মো. আব্দুস সামাদ ২১

ইতিহাস-ঐতিহ্য
খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে কাযী ইমাম আবূ ইউসুফের ঐতিহাসিক পত্র/মোহাম্মদ নিবরাস উল্লাহ ২৭

কুরআনের গল্প
রানি বিলকিসের সিংহাসন ২৯

মসনবীর গল্প
দুর্ভাগ্যই খুলে দেয় সৌভাগ্যের কপাট/ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩২

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩৫
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৬
এক নজরে গতমাস ৩৮
কবিতা ৪১
আবাবীল ফৌজ ৪২
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়



نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

প্রতি বৎসর ১১ রবীউস সানী তারিখে মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে জগদ্বীখ্যাত সাধক বুযুর্গ ও গাউসুল আযম মাহবুবে সুবহানী হযরত শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর স্মৃতিবার্ষিকী পালন করা হয়ে থাকে। তিনি ৫৬১ হিজরী সালের এই তারিখে ইন্তিকাল করেন। শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর ওফাত বার্ষিকীকে ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম বলা হয়ে থাকে, 'গিয়ারভী শরীফ' নামেও এই দিবসটি পরিচিত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এতদাঞ্চলে ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহম ১১ই রবীউস সানী তারিখে উদযাপিত হলেও গাউসুল আযমের মাযার যেখানে অবস্থিত সেখানে অর্থাৎ বাগদাদে একই মাসের ১৭ তারিখে পালিত হয় বলে জানা যায়। এই ভিন্নতা তাঁর ওফাতের তারিখে মতবিরোধ থাকার দরুনই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে বড়পীর ছাহেবের জীবনী লেখকগণ তাঁর ওফাত সন ও মাসে একমত যে, নব্বই বৎসর বয়সে হিজরী ৫৬১ সালের (মুতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) রবীউস সানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উস্তাদ ও 'নূরুল আনওয়ার' নামক গ্রন্থের রচয়িতা মুল্লা জয়ুনের পুত্র মুল্লা মুহাম্মদ তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, অন্যান্য মাশায়িখের ঈসালে সাওয়াব বৎসর শেষে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হযরত বড়পীর সাহেবের এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শান যে বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক তাঁর ঈসালে সাওয়াব (গিয়ারভী শরীফ) প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত করা হয়েছে। এই দিবসের কর্মসূচির মধ্যে সাধারণত কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী তথা মুসলিম জনসাধারণ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ ও সালাম, অধিক পরিমাণে কালিমা-ই-তায়্যিবাহ পাঠ, যিকর-আযকার ও খানাপিনা বণ্টন ইত্যাদি করে থাকেন। এই পবিত্র দিবস উপলক্ষে গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেকের জীবনকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা এবং তা বাস্তব জীবনে যথার্থ অনুসরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহম এর তাৎপর্য। তিনি তাসাওউফ সাধনা ও দ্বীন প্রচারের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার পবিত্র জীবনচরিত হতে তা গ্রহণ করা উচিত, তাঁর রচনাবলিতেও গাউসুল আযম (র.) এর অনুপম আদর্শ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য তাঁর 'কাসীদা ই গাউসিয়া' পাঠ করার উপর অনেকেই গুরুত্বারোপ করেছেন। যে মহান মনীষীর দ্বীন প্রচারে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সেই মহান সাধকের গোটা জীবনচরিত সকলের অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া উচিত।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ– وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ– الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ–

অনুবাদঃ হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না। আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরাতো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়। আর এরাই সৎপথে পরিচালিত। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কাবাঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে সাঈ করলে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বত:স্ফুর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩-১৫৮)

তাফসীর:

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

-আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে মৃত বলবে না যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। আসলে তারা মৃত নয়, তারা জীবিত, যা তোমরা জানো না। অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য ও ধৈর্য্যধারণ করে, শত্রুদের সাথে জিহাদ করে গোনাহ ত্যাগ করে, ফরয আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যুবরণ করেছেন যারা, তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত অথচ তোমরা তা জানো না।[১]

এখানে প্রশ্ন আসে শুধু কেন যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে জীবিত বলা হলো। অন্যদেরকে আমভাবে কেন বলা হলো না? অথচ মহানবী ﷺ হতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, তিনি মুমিন ও কাফির সকলের জন্য মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা করেন। মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, জান্নাতের সাথে তাদের কবরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তারা সেদিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে আর স্বল্পকালের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত করানোর জন্য তারা প্রার্থনা করবেন, যাতে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত আবাসস্থলে যেতে পারেন। সেখানে তাদের সাথে তাদের পরিবার পরিজন ও সন্তানাদির মিলন ঘটবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের কবরের সাথে আর দুযখের সাথে দরজা করে দেওয়া হয়। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে যেন কিয়ামত তাড়াতাড়ি সংঘটিত না হয়। যেন তাদেরকে তাড়াতাড়ি দুযখে যেতে না হয়। এমনিভাবে আরও হাদীস বর্ণিত আছে। প্রশ্ন হলো আয়াতে কেন কেবলমাত্র শহীদদেরকে বিশেষিত করা হলো? অথচ শহীদগণ ছাড়াও অন্যান্য মুমিন এমনকি কাফিরগণও বরযখের (কবরের) জীবনে জীবিত থাকবেন। কাফিরগণ সেখানে সংকীর্ণ জীবন-যাপনের মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর মুমিনগণ বেহেশতের সুগন্ধি ও সুঘ্রাণ উপভোগের মাধ্যমে নিআমতপ্রাপ্ত হবে। এর জবাবে বলা হয় অন্যান্য সকল মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল শহীদগণকেই আলমে বরযখে পুনরুত্থানের পূর্বে বেহেশতের নিআমতরাজি উপভোগ করতে দেওয়া হবে। অপরদিকে অন্যান্য মুমিনগণকে নিআমত দেওয়া হবে পুনরুত্থানের পর বেহেশতে প্রবেশ করার পর। আর এটাই হচ্ছে- অন্যান্যদের চেয়ে শহীদগণের

ফদীলত। যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ সংবাদই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর কাছে এভাবে দিয়েছেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ– فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

-যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে রিযক দেওয়া হয়। তারা খুবই আনন্দে আছে ঐ সমস্ত জিনিস নিয়ে, যা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৯)[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ نَهَرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بكرة وعشياً.

-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নহরের পার্শ্বে সবুজ বাগানের মধ্যে অবস্থান করবে। এখান হতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা রিযক প্রদান করা হচ্ছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তোমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারো না। অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। জেনে রাখো, এরা জীবিত।[৩]

ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ

-অবশ্যই আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করব যেমন ভয়, ক্ষুধা, মালের ও প্রাণের ক্ষতি করে, ফসলাদির ক্ষতি করে। আর ঐসব লোকদের জন্যে সুসংবাদ, যারা এ ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের ভয় ভীতি দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব, ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা মানে হচ্ছে- দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, ফলে তোমাদের সম্পদের স্বল্পতা দেখা দেবে। প্রাণহানীর পরীক্ষা হলো, তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের কাফির শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হবে। তা ছাড়া তোমাদের ছোট ছোট সন্তানাদি অকালে মারা যাবে। খরাজনিত কারণে তোমাদের ফসলের সংকীর্ণতা দেখা দেবে। এসবই হচ্ছে আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যাবে ঈমানের ক্ষেত্রে কারা তোমাদের বন্ধু এবং ধর্মের ক্ষেত্রে কারা সত্যদ্রষ্টা ও কারা মুনাফিক তাও প্রকাশিত হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।[৪]

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

-হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্য্যধারণকারীদেরকে যারা জানে, যেসব কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আমার পক্ষ থেকে নিআমত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তারা আমার দাসত্ব মেনে নেয়, তারা পালনকর্তা হিসেবে এককভাবে আমাকেই মানে। তারা বিশ্বাস করে আমার প্রতি তাদের প্রত্যাবর্তনকে; আর তারা আমার ফায়সালাকে মেনে নেয়, আমার সাওয়াবের আশা করে, আমার শাস্তির ভয় পায়, আমার পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা বলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের রাজত্বের অধীন, আমরা তার দাস। মৃত্যুর পর আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ধৈর্য্যধারনকারীদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মুসীবত পৌঁছার সাথে সাথে বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী।[৫]

أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

صلوة শব্দের অর্থ 'ক্ষমা' আর রহমত অর্থ 'দয়া' المُهْتَدُون শব্দের অর্থ সত্য পথ প্রাপ্ত। ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তির উপরই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মাগফিরাত আর রহমত রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথের পথচারী।[৬]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ -অবশ্যই মুমিন যখন তার সকল ব্যাপারকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয় এবং মুসীবতের সময় তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আল্লাহ তার জন্য তিনটি জিনিস নির্ধারণ করেন, যার মধ্যে তার মঙ্গল নিহিত থাকে।الصلوة অর্থ আল্লাহর রহমত, আল্লাহ ও হিদায়াতের পথ পাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসীবত দেখে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য মুসীবতকে নিয়ন্ত্রণ করে দেন। পরকালে উত্তম প্রতিদান দেন, তার জন্য উত্তম উত্তরসূরী সৃষ্টি করেন, যার উপর সে সন্তুষ্ট হয়।[৭]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْم

الصفا শব্দটি صفاة শব্দের বহুবচন। আবার কেউ বলেন صفا একবচন, এর দ্বিবচন হচ্ছে صفوان এবং বহুবচন হচ্ছে صفيا صفيا–اصفاء অর্থ প্রকান্ড পাথর খন্ড। আর মারওয়া শব্দের অর্থ ছোট ছোট পাথর, এর جمع قلت হয় مروات।[৮]

উহা হেরেম শরীফের দুটি পাহাড়ের নাম। এ আয়াতে صفا ও مروة দ্বারা ঐ দুটি পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। তাই الف لام আনা হয়েছে যেন নির্দিষ্ট ঐ পাহাড়দ্বয় বুঝা যায়।[৯]

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। এ দুপাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ান আবশ্যক, যা হজ্জের আহকামের মধ্যে একটি হুকুম। আল্লাহ তাআলার দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এ দুপাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোর জন্য, যখন ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার কাছে مناسك الحج দেখানোর জন্য প্রার্থনা করছিলেন। এটা خبر হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা امر উদ্দেশ্য। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এভাবে বলেছিলেন- ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا -অতঃপর হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে নির্দেশ করেছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার জন্য। (সূরা নহল-১২৩) এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমকে ইমাম নির্ধারণ করেছেন ঐসব লোকদের, যারা এর পরে দুনিয়াতে এসেছেন। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করা এবং সাঈ অর্থাৎ দৌড় যদি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হয় এবং مناسك الحج এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে একথা স্পষ্টতঃ বলতে হবে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ নির্দেশ মুতাবিক আমল করেছিলেন এবং পরবর্তী সকলের জন্য এটা আবশ্যকীয় হয়ে আছে। আমাদের নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতকে তাঁর অনুসরণ করার জন্য আদেশ করেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তদ্রুপ আমল করা সকলের উপর ওয়াজিব।[১০]

১. তাবারী, ৩/২১৪; ২. তাবারী, ৩/২১৬; ৩. তাবারী, ৩/২১৭; ৪. তাবারী, ৩/২২০; ৫. তাবারী, ৩/২২২; ৬. তাবারী, ৩/২২২; ৭. তাবারী, ৩/২২৩; ৮. তাবারী, ৩/২২৪-২২৫; ৯. তাবারী, ৩/২২৬; ১০. তাবারী, ৩/২২৭-২২৮;



অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما)

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার কারণে আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল এবং তাদের জোরপূর্বক যে কাজে বাধ্য করা হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। (হাদীসটি হাসান। ইবন মাজাহ, বাইহাকী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সারা সৃষ্টির জন্য রহমত। মুমিনদের জন্য আল্লাহর অপার অনুগ্রহ । তাঁর ওসীলায় এই উম্মত এমন অনেক বিষয় লাভ করেছে, যা অতীতের উম্মতগণ লাভ করেনি। আলোচ্য হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ এর ওসীলায় প্রাপ্ত উম্মতের তিনটি বিশেষ নিআমতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো হলো-

১. অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ক্ষমা

২. ভুলে যাওয়া বিষয়ের ক্ষমা

৩. জোরপূর্বক যে কাজে বাধ্য করা হয় এর গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি।

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদীসকে ইসলামের অর্ধেক হিসেবে গণ্য করা উচিত। কেননা যেকোনো কাজ হয়তো ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দে হয় অথবা তার ইচ্ছা ও পছন্দ ছাড়াই হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয়তো এটি ভুলবশত (অনিচ্ছাকৃত) হতে পারে অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে হতে পারে কিংবা বাধ্য হওয়ার কারণে হতে পারে। এই প্রকারের অপরাধ যে মাফ এ বিষয়ে সকলেই একমত। তবে শুধু কি গুনাহ মাফ হবে, নাকি হুকুম, নাকি উভয়টি মাফ হবে, এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা উভয়টি মাফ হওয়ার কথা বুঝা যায়। আর হত্যাসহ অন্যান্য যেসকল বিষয় এই হুকুমের আওতা বহির্ভূত হয় সেগুলোর স্বতন্ত্র দলীল রয়েছে। (ফাতহুল বারী)

আল্লামা ইবন বাত্তাল (র.) বলেন, সকল ফুকাহায়ে কিরাম একমত যে, হাদীসে উল্লেখিত মাফ দ্বারা গুনাহ মাফ উদ্দেশ্য।

> অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, ভুলে যাওয়া কিংবা বাধ্য হওয়ার কারণে কৃত গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে শাস্তি মাফ হয় না।

এই শেষোক্ত মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই যেসব আমলের কাযার বিধান রয়েছে তা ভুলে যাওয়ার কারণে সময়মত আদায় করতে না পারলে এগুলোর কাযা করতে হবে। তবে ভুলে যাওয়ার কারণে গুনাহ হবে না। যেমন, কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র নামায পড়ে নিবে। নিসইয়ান তথা ভুলে যাওয়ার কারণে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়াতে সে গুনাহগার হবে না। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَن نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كَفّارَةَ لَها إلّا ذلكَ

-যে নামাযের কথা ভুলে যায় সে স্মরণ হওয়া মাত্র যেন নামায পড়ে নেয়। এর অন্য কোনো কাফফারা নেই। বরং এটিই (আদায় করাই) এর কাফফারা। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭০; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৯)

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির কোনো হক অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে লঙ্ঘিত হলে তা মাফ হবে না। ভুলবশত কোনো অপরাধ হয়ে গেলে গুনাহ থেকে মুক্তি পেলেও শরীআত নির্ধারিত শাস্তি মাফ হবে না। ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা আবশ্যক হবে। ইহরাম অবস্থায় প্রাণি শিকার করলে দম বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। এ বিষয়ে মাযহাবের উলামায়ে কিরামগণের রায় ফিকহের কিতাবাদিতে সুবিন্যস্ত আছে। সে আলোকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

কাউকে কোনো অপরাধে বাধ্য করা হলে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী এর বিধান হবে। যেমন, ফরয রোযা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে শারীরীক সম্পর্কে বাধ্য করলে স্বামী গুনাহগার হবে। স্ত্রী গুনাহগার হবে না। তবে ঐ রোযা স্ত্রীকে কাযা করতে হবে এবং স্বামীর উপর কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

যদি কাউকে জোরপূর্বক তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হয় এবং সে তালাকের শব্দ উচ্চারণ করে তাহলে স্ত্রী তালাক হবে। অনুরূপভাবে কাউকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা হলে সে যদি শরীআত নির্ধারিত স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব/কবূল করে তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সারকথা হলো, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, ভুলে যাওয়া কিংবা বাধ্য হওয়ার কারণে কৃত গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে শাস্তি মাফ হয় না। অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হক হলে তাও মাফ হয় না । আর কাযাযোগ্য বিধান হলে এর কাযা করা আবশ্যক হয়। সুতরাং হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর না করে এ জাতীয় বিষয়ে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী।

জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)



নিখিলের সুন্দরতম সৃষ্টি, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানব শিক্ষক, ইনসানে কামিল, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান রাব্বুল আলামীন উত্তম আদর্শ ও সুমহান চরিত্রের অধিকারী করে এ ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন। সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন কামিল বা পরিপূর্ণ এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন সর্বাধিক জ্ঞান। তাই আমরা তাঁর মহান জীবনের যে দিকেই তাকাই সেখানেই দেখতে পাই তার শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি নিছক একজন ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, আর্ন্তজাতিক জীবন ও সামরিক জীবন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও উত্তম আদর্শ। এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে জিহাদের ময়দানে আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ সমরবিদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকটিই তুলে ধরার প্রয়াস পাব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে যতগুলো যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল অত্যাবশ্যকীয় ও আত্মরক্ষামূলক। নবুওয়াতের তেরটি বৎসর কাটল মক্কায়, এখানে তো কেবলমাত্র একতরফা শুধু যুলম-নির্যাতন হজমই করলেন, কোনো প্রতিরোধই নেই। হিজরতের পর মাদানী জীবনে আসল জিহাদের নির্দেশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে কতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও একথায় সকলই একমত যে, তাঁর উপস্থিতিতে কেবল মাত্র নয়টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বাকীগুলোতে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি। কেবল মাত্র উহুদে সাময়িক পরাজয় ছাড়া বাকী সবগুলোতেই তিনি বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই বিজয় লাভ করার পরও শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জোর যার মুল্লুক তার এ নীতিতে তিনি কখনও বিশ্বাসী ছিলেন না এবং একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম তলোয়ারের বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিরুদ্ধবাদীদের এ অভিমত অপবাদ বৈ অন্য কিছুই নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সংঘটিত এ সকল যুদ্ধে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। সত্যিই যদি এ যুদ্ধ গুলো অত্যাচার ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হতো তাহলে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা এত কম হওয়ার কথা নয় বরং বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার কথা। যেমন আমরা ঐতিহাসিকগণের পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি এ সকল যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বন্দী সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬,৫৬৪ জন এবং নিহত হয়েছিল ৭৫৯ জন। আর মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন ২৫৯ জন এবং বন্দী হয়েছিলেন মাত্র একজন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের পর ৬,৩৪৮ জনকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং মাত্র একজনকে খুনের দায়ে হত্যা করেছিলেন। বদরের ৭০ জন বন্দীকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। বাকী ১৪৫ জনকে ও পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের এ সকল যুদ্ধের হতাহত ও বন্দীদের পরিসংখ্যানকে পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক যুদ্ধের বন্দী ও নিহতদের সংখ্যার সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের এ সকল জিহাদের হতাহত ও বন্দীদের সংখ্যা নিতান্তই কম, যার দরুন পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, মুসলমানগণ কেবল মাত্র প্রতিরোধমূলক ভাবেই অস্ত্র ধরেছিলেন অন্য কোন কারণে নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধ কৌশল ছিল অত্যাধুনিক ও সুশিক্ষিত সমরবিদদের চেয়েও সুনিপূণ। কেননা যুদ্ধ করা কিংবা শত্রু হত্যা করা তো তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল মাত্র শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করাই তার উদ্দেশ্য। তাই তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল এমন এক পরিকল্পনা সম্বলিত যাতে অতি কম সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে। তাই তিনি সহজ কৌশল হিসেবে প্রাচীন আরবীয় রীতির অনুকরণে মল্ল যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা করতেন। যেমন বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) ওতবার সাথে, আলী (রা.) শাইবার সাথে এবং উবাইদা (রা.) ওয়ালিদের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে তাওরিয়া করতেন। অর্থাৎ যুদ্ধ যেদিকে হবে তার বিপরীত দিকে রওয়ানা করতেন এবং যথাসম্ভব তা গোপন রাখতেন। উদ্দেশ্য হলো অতর্কিত উপস্থিতির কারণে শত্রুরা যাতে হতচকিত হয়ে যায় এবং রক্তপাত ব্যতিরেকেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায় । তিনি নিজেই বলতেন 'আল হারবু খিদাউন' অর্থ্যাৎ যুদ্ধ কৌশল মাত্র। তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত ভোরবেলা আক্রমণ শুরু করতেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের উপর হামলা করতে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন আর যদি আযান শুনতেন তবে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য সব সময়ই ছিল ক্ষয়ক্ষতি কম হোক কিংবা যুদ্ধ ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাক। যেমন তিনি ফাতহে মক্কার সময় আগত মুসলমানদের সংখ্যা অধিক দেখানোর জন্য এমন এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করলেন যা তাঁর সমর বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ বহন করে। তিনি তার বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, রান্না-বান্নার জন্য চুলা যেন বেশি করে তৈরী করা হয় এবং

শৌচাগার যেন কম নির্মাণ করা হয়। উদ্দেশ্য হলো সৈন্য সংখ্যা বেশি দেখে শত্রুবাহিনীর মনে ভীতির সঞ্চার হবে এবং রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় হয়ে যাবে। আর পরবর্তীতে তাই হয়েছিল। অপর এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূল ﷺ এর অভ্যাস ছিল যখন ফজরের সময় হয়ে যেত, সূর্যোদয় পর্যন্ত বিরত থাকতেন। যখন সূর্যোদয় হতো, যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে যুদ্ধ বন্ধ রাখতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে না পড়তো ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। (অর্থাৎ আসর পর্যন্ত) তিনি বলতেন সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মুমিনগণ নামাযে নিজ সৈন্যদের জন্য দুআ করতেন। জিহাদের ময়দানে ও হুযূর ﷺ বিশেষ পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন, যাকে 'সালাতুল খাওফ' বলা হয়। জিহাদের ময়দানে রাসূল ﷺ যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে কিছু নির্ভুল সংকেত শিক্ষা দিতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি বলেছিলেন, যদি রাতের বেলা শত্রু আক্রমণ করে তবে তোমাদের প্রতীক ধ্বনি হবে হা-মীম লা ইউনসারুন অন্য এক যুদ্ধে মুহাজিরদের সংকেত ছিল আব্দুল্লাহ আর আনসারদের ছিল আব্দুর রহমান। বাংকার খননের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতিহত করাও রাসূল ﷺ এর রণকৌশলের অন্যতম শিক্ষা। ৫ম হিজরীতে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর পরামর্শক্রমে স্বয়ং রাসূলে পাক ﷺ সাহাবায়ে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বল্প সময়ের মধ্যে ৫ গজ গভীর এবং বিরাট দীর্ঘ পরিখা খনন সম্পন্ন করেন। এ সময়ের রণ সংগীত ছিল-

আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশুল আখিরা
ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা

মহানবী ﷺ এর দূরদর্শিতা ও রণ কৌশল কত যে প্রখর তা প্রমাণিত হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে। প্রায় সব কটি শর্তই মুসলমানদের প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ঐতিহাসিকগণ যুগে যুগে তাঁর এ বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করে আসছেন । সাময়িক এ যুদ্ধ বিরতির ফল হয়েছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। যেখানে সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত সেখানে মাত্র দুবছরের যুদ্ধ বিরতির সুবাদে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ (দশ) হাজার এবং আরও দুবছর পর অর্থাৎ দশম হিজরীতে আরাফাতের ময়দানে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় একলক্ষ চৌদ্দ হাজার মতান্তরে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার।

মহানবী ﷺ এর রণকৌশলে মানবতার স্থান ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। বেসামরিক স্থাপনা, আবাদী ভূমি, ফলবান বৃক্ষ, ধর্মযাজকগণ, শিশু ও নারীগণ তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলো না। তিনি তাঁর প্রতিনিধিদেরকে সাবধান করে দিতেন, জিহাদে যাও তবে গণীমতের মাল খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রুকে বিকলাঙ্গ করবে না এবং শিশুদেরকে হত্যা করবেনা। যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ মহানবী ﷺ এর রণকৌশলের একটি উজ্জ্বল আদর্শ। পরাজিত বীরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তাঁর আদর্শ ছিল না। তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বন্দী ভাগ করে দিতেন এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। তিনি রাতের বেলায় বন্দীদের খোঁজ খবর নিতেন এবং বন্দীদের বাঁধন সহজ করে দিতেন। এজন্যই জনৈক বন্দীর জবানীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর বলেন, মদীনাবাসীদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তারা আমাদেরকে সওয়ারীতে দিয়ে নিজেরা হেঁটে চলতো, নিজেদের সামান্য রুটিও নিজেরা না খেয়ে আমাদেরকে খেতে দিত আর নিজেরা খোরমা খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করত। এছাড়াও তিনি মুক্তিপণের বিনিময়ে অথবা শিক্ষাদানের বিনিময়ে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা শর্তেও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন । উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু শান্তির ক্ষেত্রে নয় জিহাদের ময়দানেও মহানবী ﷺ জ্ঞান ও যোগ্যতায় একজন বীর সৈনিক এবং মানবতার একক আদর্শ।

মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ

ভর্তি চলছে

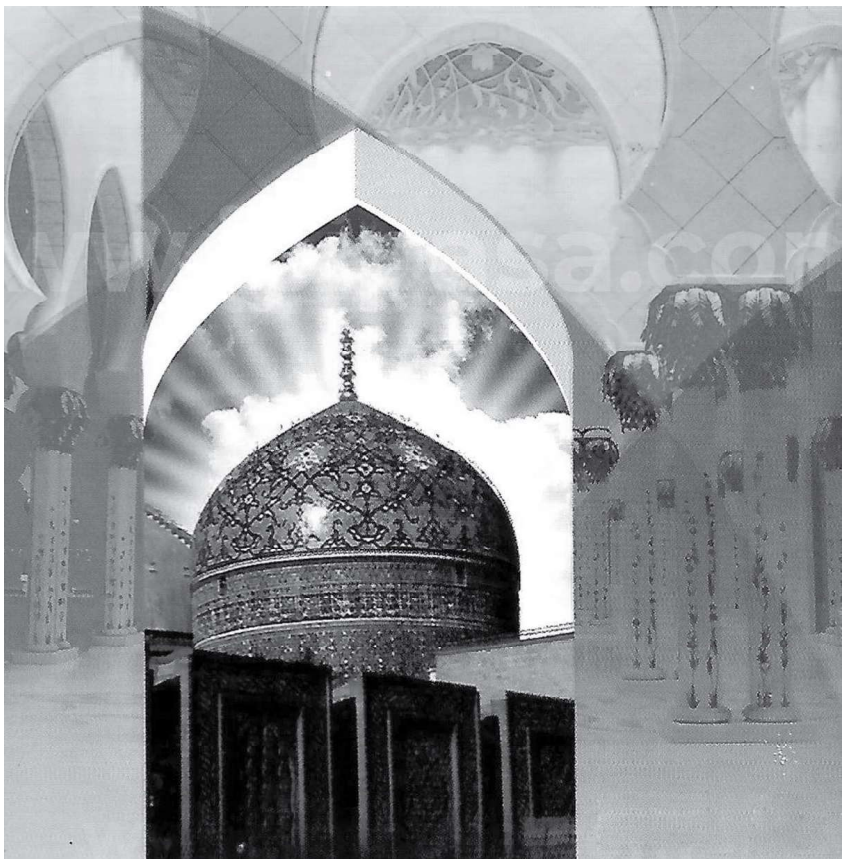
প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাক্বী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।

সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)

বাসা-২৩, ব্লক-ডি, রোড-১৪, শাহ্‌জালাল উপশহর, সিলেট



বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.)

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

বহুল প্রচলিত সূফী তরীকাগুলোর মধ্যে কাদিরিয়া তরীকা অন্যতম। এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)। বাগদাদের এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় সূফী মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে সমানভাবে পরিচিত। তিনি সমসাময়িক মুসলিম সমাজে যেমন বিরাট ইতিবাচক প্রভাব রেখেছিলেন, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শিষ্যদের হাতে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। নুরুদ্দীন জংগী এবং সালাহুদ্দীন আইয়ুবীগণ যেভাবে ইসলামের সোনালি যুগ ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার পেছনে শাইখ জিলানী (র.) এর অবদান অনেকটাই আজ বিস্মৃত। তাসাউফে তিনি যে মূল্যবোধ তুলে ধরেছিলেন, অর্থাৎ শরীআতের একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সেই মূল্যবোধও আজ কাদিরিয়া তরীকার দাবিদার অনেকের ভেতর নেই। এজন্য তাঁর জীবন ও অবদানের পুনর্পাঠ জরুরী।

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর উপনাম আবূ মুহাম্মদ। ইবন রজব হাম্বলী হাসান ইবন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার দিকে তাঁর বংশধারা সাব্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, মুহাম্মদ ইবন শাকির প্রমুখ তাঁর বংশধারা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দিকে সাব্যস্ত করেছেন। তবে দু'ধরণের মতের সাথে সমন্বয় করে বলা যায়, বাবার দিক থেকে তিনি হাসানী এবং মায়ের দিক থেকে হুসাইনী ছিলেন। শাইখ জিলানী (র.) তাঁর মা ফাতিমা উম্মুল খাইর বিনতু আব্দুল্লাহ আস সাওমাঈকে নিয়ে নিজেই বলেছেন, 'আমার মায়ের বংশধারা হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মিলিত হয়েছে।'

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইরানের গিলান বা জিলান প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত নিফ নামক শহরে ২৯ শাবান, ৪৭০ হি./১৭ মার্চ ১০৭৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য কেউ কেউ ৪৭১ ও ৪৯১ হিজরীর কথাও বলেছেন। গিলান প্রদেশের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে জিলানী, গিলানী, কিলানী ইত্যাদি বলা হয়। ইবনুল আসির, ইবন কাসির, যাহাবিসহ কেউ কেউ জিলানী বা কিলানীর বদলে জিলি বলেছেন। মুহই-উদ-দীন, ইমাম, শাইখুল মাশায়িখ, শাইখুল ইসলাম, গাউসুল আযম, তাজুল আরিফীন, কুতবে বাগদাদ, বাযুল্লাহিল আশহাবসহ বহু উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

শাইখ জিলানী (র.) এর পিতা আবূ সালিহ মূসা নিজেও আত্মশুদ্ধি ও নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এজন্য তাঁর একটি উপাধি ছিল মুহিব্বুল জিহাদ।

শাইখ জিলানী (র.) ছিলেন মা-বাবার সর্বশেষ সন্তান। কারণ তাঁর জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবা ইন্তিকাল করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তখন তাঁর মায়ের বয়সও ছিল ষাটের কোঠায়। বেশি বয়সে সন্তান লাভ করা ছিল কুরাইশ গোত্রের নারীদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, পিতা আবূ সালিহ মূসার ইন্তিকালের পর নানা আব্দুল্লাহ সাওমাঈ তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে ইবনুস সাওমাঈও বলা হতো। আব্দুল্লাহ এতই ইবাদতগুযার ছিলেন যে, সাওমাঈ (ইবাদতখানা) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এভাবেই বিদূষী মা আর যাহিদ নানার সংস্পর্শে একজন দুনিয়াবিরাগী পুতঃপবিত্র মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠেন।

তাঁর আরও একজন ভাই ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ বাগদাদে রওয়ানা হবার সময় তাঁর মা ফাতিমা বিনতু আব্দুল্লাহ তাঁদের দুজনের মধ্যে সমুদয় সম্পদ ভাগ করে

দিয়েছিলেন। শাযারাতুয যাহাবের বর্ণনামতে, এই ভাইয়ের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তিনি বাগদাদেই অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন।

শাইখ জিলানী (র.) এর অসংখ্য কারামত ছোটবেলা থেকেই জাহির হওয়া শুরু হয়েছিল। রামাদান মাসে দিনের বেলায় তিনি দুধ খেতেন না। তাঁর এ কারামত এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, জিলানে কখনও মেঘের জন্য রামাদানের চাঁদ দেখা না গেলে লোকেরা খোঁজ নিত, আবূ সালিহের পুত্র আব্দুল কাদির দুধ খেয়েছেন কি না? এর উপর ভিত্তি করে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিতেন, পরবর্তীতে সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হতো।

একটু বড় হবার পর শষ্যক্ষেত্রে একটি ষাঁড় বড়পীর (র.) কে বলেছিল, 'কৃষক হবার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি।' এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাঁদের একটি কৃষিজমি ছিল। তিনি সেখানে কাজ করতেন এবং তাঁদের কিছু গরু-মহিষও ছিল। ইবরাহীম ইবন আদহামের সাথে ঘোড়ার জীনের কথার মতো এই ষাঁড়ের কথাও তাঁর জন্য বিশেষ ইঙ্গিতবাহী ছিল।

এ ঘটনায় জিলানী (র.) এর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বেড়ে যায়। তখন বাগদাদ ছিল জ্ঞানের শহর হিসেবে বিবেচিত। তিনি বাগদাদ যেতে মনস্থ করলেন।

ইবন হাজার আসকালানী (র.) আবূ মুহাম্মদ আল জুব্বাইয়ের বরাতে উল্লেখ করেছেন, শাইখ জিলানী (র.) বলেছেন, 'আমার মা আমাকে ইলম অর্জনের জন্য বাগদাদ যেতে বলেছিলেন। তাই ষোলো অথবা আঠারো বছর বয়সে আমি ইলমের সন্ধানে এক শহর থেকে আরেক শহরে চলে গেলাম।'

শাইখ জিলানী (র.) পরিবার পরিজন ছেড়ে এভাবেই একটি কাফেলার সাথে ভাইয়ের সাথে বাগদাদ রওয়ানা হলেন। তাঁর মা আবূ সালিহ মুসা জংগী দোস্তের রেখে যাওয়া আশিটি দিনার দুভাইয়ের মাঝে ভাগ করে দিলেন। পথিমধ্যে ডাকাত দলের হিদায়াত হবার কথা সবাই জানেন। সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে শাইখ জিলানী (র.) এর যখন বাগদাদে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর বয়স ১৮, সময়টা ৪৮৮ হিজরী। চলছে খলীফা মুসতাযহিরের শাসন (৪৮৭-৫১২ হি:)। একই বছর ইমাম আবূ হামিদ আল গাযালী বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতা ছেড়ে নির্জনবাসের জন্য সিরিয়া ও হিজায সফরে চলে গেলেন। একজন গাযালীর তিরোধানের পর যেন আরেকজন গাযালীর আবির্ভাব হলো বাগদাদে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা আর সংস্কৃতির কিংবদন্তীতুল্য নগরী বাগদাদে শাইখ জিলানী (র.) ৪৮৮ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল পর্যন্ত ৭৩ বছর অবস্থান করেছিলেন। মোটা দাগে তাঁর বাগদাদের জীবনকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়:

ক. বাগদাদে প্রবেশ থেকে মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ কাল (৪৮৮-৫২১ হি:)

খ. শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে ইন্তিকাল (৫২১- ৫৬১ হি:)

ক. বাগদাদে প্রবেশ থেকে মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ কাল (৪৮৮-৫২১ হি:)

শাইখ জিলানী (র.) এর আগমনের আগের কয়েকশ বছর ধরেই বাগদাদে চলছে জ্ঞানীগুণীদের আনাগোনা, চারিদিকে তাঁদের অসংখ্য কালোত্তীর্ণ বইয়ের ছড়াছড়ি। যেমন ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) ও তাঁর ইহইয়া, ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (মৃ. ৫০২ হি.) ও তাঁর মুফরাদাত, ইমাম কুশাইরী (মৃ. ৪৬৫ হি.) ও তাঁর রিসালা, আল্লামা যামাখশারী (মৃ. ৫৩৭ হি.) ও তাঁর কাশশাফ, আল্লামা মাওয়ার্দী (মৃ. ৪৫০ হি.) ও তাঁর আহকামুস সুলতানিয়্যা, ইমাম আবুল হাসান আল আশআরী (মৃ. ৩২৪ হি.) ও তাঁর মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, আশ শাইখুর রঈস ইবন সীনা (৪২৮ হি.) ও তাঁর কিতাবুশ শিফা, আল্লামা হারিরী (মৃ. ৫১৭ হি.) ও তাঁর মাকামাত ইত্যাদি। কিন্তু এতসব শাস্ত্রের ভীড়ে তিনি সবার আগে ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রকে বেছে নিলেন। এদিকে পিতৃহীন এই শাইখকে বিরাট অর্থকষ্ট আর অভাবের সম্মুখীন হতে হলো।

বাগদাদের মতো নগরীতে চল্লিশ দীনার খুব বেশি কিছু নয়। তার উপর শাইখ জিলানী (র.) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। মায়ের সেলাই করে দেওয়া সেই দিনারগুলো অচিরেই শেষ হয়ে গেল। কখনও কখনও তাঁর মা লোকজনের মাধ্যমে কিছু টাকাকড়ি পাঠাতেন। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।

তীব্র অর্থকষ্ট ও অভাবের মধ্যেও তিনি অসংখ্য শাইখের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। সবার নাম ইতিহাস সংরক্ষণ করতে না পারলেও বিখ্যাত কয়েকজনের নাম জানা যায়। যেমন তিনি হাদীস শুনেছেন আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবন হাসান আল বাকিল্লানী, আবূ বকর আহমদ ইবনুল মুযাফফর, আবুল কাসিম আলী ইবন বাফান আর রাযযায, আবূ মুহাম্মদ জাফর ইবন আহমদ আস সররাজ, আবূ সাদ মুহাম্মদ ইবন খুশাইশ, আবূ তালিব ইবন ইউসুফ প্রমুখের কাছ থেকে। ফিকহ শিক্ষা করেছেন বাগদাদে হাম্বলীদের শাইখ আবুল ওয়াফা আলি ইবন আকীল, আবুল খাত্তাব মাহফুজ ইবন আহমদ হাম্বলী, কাজী আবূ সাদ মুবারক ইবন আলী আল মুখাররিমি, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল কাজী আবূ ইয়ালা আল ফাররা হাম্বলী প্রমুখের কাছ থেকে। শুধু ফিকহে হাম্বলী নয়, ফিকহে শাফেঈর উপরও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এছাড়া আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া আত তিবরিযীর কাছে সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং আবুল ওয়াফা আলী ইবন আকীল ও আবুল খাত্তাব মাহফুযের কাছে কুরআন পঠনরীতি ও তাফসীর সম্পর্কে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

ইসলামী শরীআতে গভীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার চর্চাও তিনি সমান গতিতে চালিয়ে গেছেন। আসলে বাগদাদে আগমনের পর থেকে তাঁর পুরো জীবনই ইলমে তাসাওউফ আর ইলমে শরীআত চর্চায় কেটেছে। পরবর্তী জীবনে একদিকে যেমন ফাতওয়া দিয়েছেন, তেমনি আরেক দিকে অসংখ্য সালিকের শাইখের দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় বাগদাদের সংগ্রাম আর দুঃখভরা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন, 'আমি জ্ঞানচর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতাম। এছাড়া আমার অভ্যাস ছিল নেককারদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা। আমি নফসকে মুজাহাদার মাধ্যমে পাকড়াও করেছিলাম। এক পর্যায়ে এক আধ্যাত্মিক অবস্থা আসলো। এমনকি এই অবস্থা মরুভূমিতে দিনরাত হতে লাগলো। এজন্য আমি ঘুরে বেড়াতাম। এক রাতে আমার ভেতর এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা তৈরী হলো যে, আমি সজোরে চিৎকার করে উঠলাম। কাছাকাছি ঘুরতে থাকা কয়েকজন লোক এতে ভয় পেয়ে গেলো। তারা এসে দেখলো আমি মাটিতে পড়ে আছি। আমাকে চিনে ফেলে বললো, এ তো আব্দুল কাদির। এ পাগল। তুমি যে আমাদের ভয় দেখালে- আল্লাহ যেন কখনও তোমার কল্যাণ না করেন।

এই লোকগুলো ছিনতাই করার জন্য রাতের বাগদাদে ঘুরে বেড়াতো।

তাসাওউফে তাঁর প্রধান শাইখ ছিলেন শাইখ হাম্মাদ ইবন মুসলিম আদ দাব্বাস রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ৫২৩ হি./ ১১৩১ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। এর আগ পর্যন্ত শাইখ জিলানী (র.) তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। শাইখ দাব্বাসের সাথে তাঁর পরিচয়ের ঘটনা অনেকটা নাটকীয়। এ বিষয়ে ইবন হাজার আসকালানী (র.) উল্লেখ করেছেন, শাইখ জিলানী (র.) বলেন,

'আমার একবার মনে হলো, এত বেশি ফিতনার জন্য বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তাই আমি কাঁধের [ব্যাগে] কুরআন ঝুলিয়ে নিলাম এবং হালাবার তোরণের দিকে এগুলাম। উদ্দেশ্য- বাগদাদ ছেড়ে মরুভূমিতে চলে যাওয়া। হঠাৎ অদৃশ্য কেউ আমাকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছো?' এরপর সে এত জোরে আমাকে ধাক্কা মারলো যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এরপর কণ্ঠটি বললো, 'ফিরে যাও। তোমার মাধ্যমে মানুষের উপকার হবে।' আমি বললাম, 'লোকের জন্য আমি কী করতে পারি? আমি নিজেই তো আমার দ্বীনের নিরাপত্তা চাই।'

সেই কণ্ঠটি আবার বললো, 'তুমি আগের জায়গায় ফিরে যাও। তোমার দ্বীনের নিরাপত্তা সেখানেই আছে।'

শাইখ জিলানী (র.) বলেন, 'এরপর আমার কিছু আধ্যাত্মিক অবস্থা নিয়ে আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বললাম, 'আল্লাহর কাছে আমার আশা- এই অবস্থাগুলো ব্যাখ্যা করার মতো কাউকে যদি তিনি পাঠাতেন!'

পরদিনের কথা। আমি জাফরিয়্যা মহল্লা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক লোক তাঁর ঘরের দরজা খুলে ডাক দিলেন, 'ওহে আব্দুল কাদির!' আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, 'গতকাল কী চেয়েছিলে?' আমি চুপ করে থাকলাম। কি বলবো- বুঝতে পারছিলাম না। তিনি ভয়ানক রেগে গিয়ে আমার মুখের উপরেই এত জোরে দরজা লাগিয়ে দিলেন যে, চৌকাঠের ধুলো আমার মুখে এসে পড়লো। সেখান থেকে কিছুদূর আসার পর আল্লাহর কাছে আমার সেই প্রার্থনার কথা মনে পড়লো। মনে হলো তিনি নিশ্চই কোন বুযুর্গ হবেন। এরপর আবার ফিরে এসে তাঁর বাসা খুঁজলাম। কিন্তু আর চিনতে পারলাম না। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

ঐ লোকটি ছিলেন শাইখ হাম্মাদ আদ দাব্বাস। পরে আমি তাঁর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, সাহচর্য লাভ করেছিলাম। যা কিছু আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল, তার সবই তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

আমি যখন জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু সময় অনুপস্থিত থাকার পর আবার তাঁর কাছে ফিরে আসতাম, তিনি বলতেন: আমার কাছে কেন এসেছো? তুমি তো ফকীহ। ফকীহদের কাছেই যাও।' আমি চুপ করে থাকতাম। এক জুমুআর দিন তিনি একদল সঙ্গী নিয়ে রুসাফা মসজিদে নামায পড়ার জন্য বাগদাদ ছেড়ে বেরুলেন। আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। তখন আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু আমরা একটি নদীর সেতুতে পৌঁছতেই আচমকা ধাক্কা মেরে আমাকে পানিতে ফেলে দিলেন। আমিও বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ। জুমুআর গোসল হয়ে গেল।' তখন আমার গায়ে একটি পশমী জোব্বা ছিল। জোব্বার আস্তিনে কয়েকটি বই ছিল। সেগুলো যাতে না ভেজে, সেজন্য আমি আস্তিন উপরে উঠিয়ে রাখলাম। তিনি আমাকে ফেলে রেখেই মুরীদদের নিয়ে চলে গেলেন। এক সময় আমি পানি থেকে উঠে জামা নিংড়ে আবার পরে নিলাম। সেদিনের ঠাণ্ডায় অনেক কষ্ট হয়েছিল, [স্বাস্থ্যেরও] ক্ষতি হয়েছিল।

শাইখ হাম্মাদ আমাকে ভীষণ কষ্ট দিতেন, মারপিট করতেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকার পর আবার যখন আসতাম, তিনি বলতেন, 'আজকে আমরা অনেক রুটি আর ফালুদা পেয়েছিলাম। সবই আমরা খেয়ে ফেলেছি, তোমার জন্য কিছুই রাখিনি।' তাঁর এমন রূঢ় আচরণ দেখে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা আমাকে টিপ্পনী কাটতো। বলতো, 'তুমি তো ফকীহ। এখানে তোমার কাজ কী? এখানে কেন আসো?'

শাইখ যখন দেখতেন, তারা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তখন আবার আমার জন্য আত্মমর্যাদাবোধ করতেন। তাদেরকে বলতেন, 'ওহে কুকুরের দল! কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছো? আল্লাহর কসম! তোমারা কেউ ওর মতো নও। আমি তো শুধু তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছি। এরপর তাকে অটল পাহাড়ের মতো পেয়েছি।'

শাইখ দাব্বাস (র.) জিলানী (র.) এর সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করলেও এটা তাঁর উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ ছিল। তাঁর সাথে তিনি যে আচরণ করছিলেন, অন্য মুরীদদের সাথে তেমন করেননি। উপরন্তু তাদেরকে কুকুর বলে সম্বোধন করেছেন। এর কারণ কেবল এটাই হতে পারে যে, তিনি চেয়েছিলেন, শাইখ জিলানী (র.) কে সবধরণের মানবীয় কলুষতা থেকে মুক্ত করা। পরবর্তীতে তিনি যেন গাউসুল আযম ও কুতবুল আকতাব হতে পারেন, সেই পথ প্রশস্ত করা।

ফুতুহুল গাইব'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইবন তাইমিয়া এভাবে শাইখ দাব্বাসের প্রশংসা করেছেন, 'শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী ও তাঁর শাইখ হাম্মাদ আদ দাব্বাসসহ হিদায়াতের উপর অবিচল অন্যান্য শাইখগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সালিক কখনও কোনো [ব্যক্তিগত] উদ্দিষ্টের ইচ্ছা করবে না। আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নিজের কোনো ইচ্ছা থাকবে না, বরং আল্লাহর কর্মধারা তার মধ্যে প্রবাহিত হবে। এভাবে সে আল্লাহর মুরাদে (ঈপ্সিত) পরিণত হবে...।'

এছাড়া আবূ সাদ বা আবূ সাঈদ মুবারক ইবন আলী ইবন হুসাইন আল মুখাররিমীর (মৃ. ৫২৮ হি.) কাছ থেকে শাইখ জিলানী (র.) এর ফিকহ শিক্ষার পাশাপাশি তাসাওউফের খিরকাও লাভ করেছেন। আমাদের দেশে বড়পীর জিলানী (র.) এর শাইখের নামের শেষে মুখাররিমীর বদলে 'মাখযুমী' বলা হয়। এটি একটি উচ্চারণগত ভুল।

সমসাময়িক আলী ইবনুল হাইতি, আবু সাঈদ আল কাইলুবি প্রমুখের মতো বিখ্যাত সুফি শাইখগণ তাঁর খানকার দরজায় এসে বসে থাকতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতেন না। বাগদাদে কোন শাযখ আসলে, তিনি যত বড় মাপের বুযুর্গই হোন না কেন, শাইখ জিলানী (র.) এর সাহচর্য, তাঁর মজলিসে একটুখানি হাযিরা না দিয়ে যেতেন না। হজ্জের সফর সহ বিভিন্ন সময় বাকা ইবন বাত্তু, আদি ইবন মুসাফির, মুসা আয যাওলী, শাইখ আহমদ আর রেফাঈ, কুযায়ব আলবান, হায়াত ইবন কাইস, শাইখ আবূ মাদয়ান, শাইখ উসমান ইবন মারযুক, রাসলান আদ দিমাশকী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সুফী শাইখগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।

জীবনীকারগণ তাঁর একাধিক আধ্যাত্মিক সিলসিলার কথা বলেছেন। আমরা ইবনুল মুলাক্কিনের বর্ণনানুসারে একটি সিলসিলা উল্লেখ করছি:

মহানবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আলী ইবন আবী তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু
হাসান আল বাসরী (র.)
হাবীব আল আযমী (র.)
দাউদ আত তাঈ (র.)
মারুফ আল কারখী (র.)
সারি আস সাকাতী (র.)
জুনাইদ আল বাগদাদী (র.)
শিবলী (র.)
ইযযুদ্দীন (র.)
আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আব্দুল আযীয আত তামিমী (র.)
আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আত তারসুসী (র.)
আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল কুরাশী (র.)
আবূ সাঈদ মুবারক ইবন আলী আল মুখাররিমী (র.)
শাইখ আবূ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী
বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলামপন্থি দল

মারজান আহমদ চৌধুরী



বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটনাবহুল দুটি মাস পার হলো। স্বৈরাচারের পতন, দখলদারি, ভাঙচুর, হত্যা, বিরোধ-বিদ্রোহ ও মাস্টারমাইন্ড নামক নাটকের মঞ্চায়ন— কী দেখিনি এই দুটি মাসে! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, জাতি হিসেবে আমরা এখনও যথেষ্ট 'বালেগ' হয়ে উঠতে পারিনি।

দেশের রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে প্রথমেই আসে সমন্বয়ক নামক একটি শ্রেণীর উত্থানের গল্প। অবশ্যই, সমন্বয়ক কোনো 'শ্রেণী' নয় এবং তাদেরকে আলাদা একটি শ্রেণী বলে তাচ্ছিল্য করার প্রয়োজন দুই মাস আগেও ছিল না। উল্টো হাসিনা সরকারের পতনের উপাখ্যানে তারা বারুদের ভূমিকায় ছিলেন। একটি কৃতজ্ঞ জাতি কখনও তাদের অবদান অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এরপর আসলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এসেই শুরু করলেন অতিমাত্রায় ছাত্রবন্দনা। সেই যে শুরু হলো, তা আর থামার নাম নেই। ইউনূস সাহেব দেশে থাকেন কিংবা বিদেশে; তাঁর মুখে ছাত্র ছাড়া আর কোনো কালাম নেই। যেন কেবল ছাত্ররা, বা আরও স্পষ্ট করে বললে সমন্বয়করা একাই ঘটিয়ে দিয়েছেন এই গণঅভ্যুত্থান। সমন্বয়কদের মধ্য থেকে দুজনকে উপদেষ্টা বানানো হলো, বাকি দুই-তিনজন দেশব্যাপী বিপ্লবের স্পিরিটকে সংহত রাখতে তৎপরতা শুরু করলেন। দিন দিন সমন্বয়কদের সংখ্যা ও খবরদারি বাড়তেই আছে। অথচ রাজনীতির মঞ্চে অপারদর্শী এসব তরুণ বুঝতেই পারছেন না যে, গণঅভ্যুত্থান পরিচালনা করা আর সরকার পরিচালনা করা এক বিষয় নয়। এরই মধ্যে বন্যার সময় টিএসসিতে উত্তোলিত ত্রাণের কোটি টাকা ব্যাংকে রেখে দেওয়া, সচিবালয়ে গিয়ে আমলাদের পদায়ন ও বদলিতে খবরদারি করা, দেশব্যাপী সফরকালে এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিতে চাওয়া, একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও প্রক্টরকে শপথ পাঠ করানো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-সমন্বয়কদের অবহেলা করাসহ নানাবিধ গুরুতর অভিযোগ উঠেছে পরিচিত সমন্বয়কদের প্রতি। বলছি না, সব অভিযোগ শতভাগ সত্য। কিন্তু এসব অভিযোগ সমন্বয়কদেরকে আলাদা একটি এলিট শ্রেণী বানিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইদানিং সমন্বয়কদের মধ্যে গ্রুপিং ও ভাঙনের কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। তরুণ সমন্বয়করা যেটি বুঝতে পারছেন না, তা হলো, খবরদারি করার জন্য প্রথমে জিম্মাদারি নিতে হয়। জিম্মাদারিবিহীন খবরদারি কেউ পছন্দ করে না। সমন্বয়কদের মধ্যে কেবল দুজন উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় দপ্তরের জিম্মাদার। তাদের জবাবদিহি আছে। বাকিদের জিম্মাদারি নেই, তাই জবাবদিহিও নেই। সুতরাং তারা কোন আক্কেলে সচিবালয়ে গিয়ে আমলাদের ওপর খবরদারি করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসিকে কোন আক্কেলে তারা শপথ পাঠ করান? কোন আক্কেলেই বা ড. ইউনূস জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সব ক্রেডিট ছাত্রদের দিয়ে দেন? এ অভ্যুত্থান তো ছিল আপামর জনতার। তাছাড়া সমন্বয়ক বা নায়ক বলতেই কেবল ঢাবির ছাত্রদেরকে সামনে নিয়ে আসা হয় কেন? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ত্যাগ ও সাহসিকতার গল্প কে বলবে?

কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের উচিত ২০১৩ সালে শাহবাগে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চ ও এর মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া। গণজাগরণ মঞ্চের মূল দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধীর বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনালের একটি আইন পরিবর্তন করা, যদিও সে দাবিও বিতর্কিত ছিল। সরকার আইন পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু মঞ্চের মুখপাত্ররা ততদিনে মজা পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে তারা আর সাধারণ জীবনে ফিরে যাননি। মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার ডাক্তারি পেশা ছেড়ে ততদিনে পেশাদার 'মুখপাত্র' বনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ধেয়ে আসা জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং পরের নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে রীতিমতো জামানত হারিয়েছিলেন। ইমরান ও তার কমরেডরা ধরে নিয়েছিলেন শাহবাগে যত লোক জড়ো হয়েছিল, সবাই তাদের ভক্ত-কর্মী। ইমরান ততদিনে নিজেকে লেনিন বা খোমেনি ভাবা শুরু করেছিলেন। ফলাফল, সেই গণজাগরণ মঞ্চ আজ মানুষের বিতৃষ্ণা ও হাসির পাত্র। মুখপাত্র গং বুঝতে পারেনি কখন কোথায় থামতে হবে। থামতে না পারার কারণে কালের গর্ভে তারা হারিয়ে গেছেন।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সমন্বয়কদেরও এখন থামার সময় হয়েছে। ৫ আগস্ট পর্যন্ত তাদের ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। ৫ আগস্ট-পরবর্তী দুই মাসে তাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ বেআইনি কর্মকাণ্ডের শক্তিশালী অভিযোগ উঠেছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, আওয়ামীলীগ-বিএনপির দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-সাংসদরা যা যা করে গেছেন, সমন্বয়করা তা-ই করছেন বা করার চেষ্টা করছেন। তারা যে জেলায়ই যাচ্ছেন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ধাওয়া খেয়ে ফিরছেন; নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে ব্যবহার করছেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে। কোথাও কোথাও অর্থ আত্মসাতের মতো অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। ভাবার বিষয় হলো, অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে দেড় শতাধিক কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের সবাই শিক্ষার্থী। এখন তাদের কাজ হলো সচিবালয়ে ভিড় না করে নিজ-নিজ শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাওয়া এবং তারকা হওয়ার চেষ্টা বা আন্দোলনকে ব্যবহার করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা না করে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া।

আর রাজনীতি করতে হলে দল গঠন করে, নিবন্ধন করে, রাষ্ট্রীয় সুবিধা না নিয়ে তৃণমূল থেকে নিজেদেরকে সুসংহত করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনীতি করা। নইলে আজকের সমন্বয়করা আগামীকাল ইমরান এইচ সরকার হতে দেরি হবে না।

জিম্মাদারিবিহীন রাজনৈতিক খবরদারির পাশাপাশি সমন্বয়কদের উচিত ইসলাম নিয়ে খবরদারি বন্ধ করা। সমন্বয়কদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে নতুন ধারার একটি 'লালনবাদী' ইসলামকে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি তারা ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ধারণা দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, 'ইনক্লুসিভ সমাজ' নামক পরিভাষাটি সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডাররা ব্যবহার করে থাকে। তাই সমন্বয়কদের বুঝা উচিত, এমনসব পরিভাষা যদি তারা ব্যবহার করেন, যেগুলো বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ট্রান্সজেন্ডারদের আমদানি করার ইঙ্গিত বহন করে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর হবে। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বাংলার মানুষ লালনের সুফীবাদকে নয়; শাহজালালের সূফীবাদকে আঁকড়ে ধরে আছে। এ সূফীবাদ শরীআতী-বেশরীআতী সবাইকে শিলপাটায় ছেঁচে মোরব্বা বানায় না। বরং শাহজালালের সুফীবাদে দাওয়াত, সাম্য ও মমত্ববোধ যেমন আছে, তেমনই শরীআতের পাবন্দি এবং জিহাদও আছে। তাই আমেরিকাকে খুশি করতে গিয়ে ইনক্লুসিভ সমাজের নামে তারা যেন ট্রান্সজেন্ডার ফিতনার পালে হাওয়া না দেন। এটি এ দেশের মুসলমানরা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

একইসাথে ড. ইউনূসের উচিত অতিমাত্রায় ছাত্রবন্ধনা থেকে বের হওয়া এবং নিজের ক্যারিশমা ব্যবহার করে পশ্চিমা অনুদান হাসিল করার প্রয়াসের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ঠিক করার চেষ্টা করা। রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনও ভঙ্গুর, পুলিশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো কাজ করছে না। অথচ ড. ইউনূসের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, হাসিনা যেরকম শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা বানিয়ে বিশ্বমঞ্চে হাযির করেছিলেন, ইউনূস সেরকম মাহফুজ আলমকে জাতির মাস্টারমাইন্ড বানিয়েই ছাড়বেন। অথচ এর কোনো দরকার ছিল না। যার যা অবদান, জাতি এমনিতেই তা স্মরণ রাখবে।

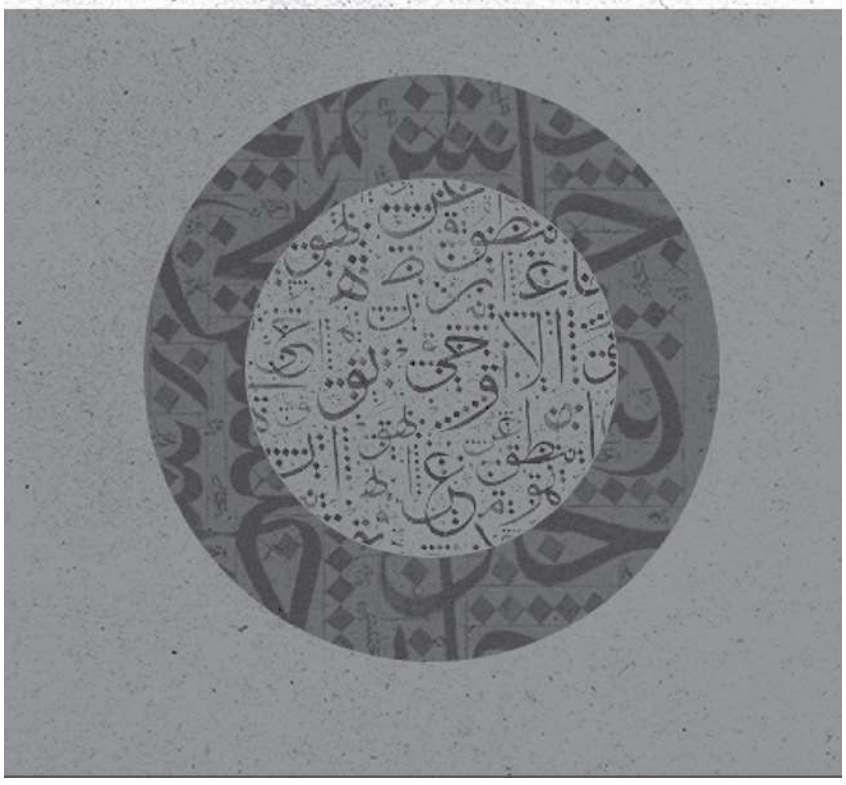
দ্বিতীয়ত, দেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর উচিত নিজেদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা। আওয়ামীলীগ আমলে দেশের বেশিরভাগ ইসলামপন্থি দল কোণঠাসা ছিল। হঠাৎ করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে তারা যেভাবে আস্ফালন শুরু করেছে, তাতে জনমনে বিতৃষ্ণার জন্ম হতে বেশি বাকি নেই। মসজিদ-মাদরাসার পদ দখল, মাযার ভাঙ্গার হুমকি, ন্যূনতম মতভিন্নতার কারণে প্রতিপক্ষের ওপর অপবাদ ও ঘৃণা ছড়ানোর পুরোনো খেলায় ইসলামপন্থিরা ভালোই মজে উঠেছেন। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কথাই ধরা যায়। এতদিন তারা মজলুম ছিলেন । কিন্তু সরকার পতনের পর আকস্মিকভাবে তাদের মধ্যে পতিত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। জোরপূর্বক মাদরাসা প্রধানের পদ দখলের চেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদে নিজেদের মানুষকে পদায়ন করা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ-অপবাদ, জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করা, ন্যূনতম সমালোচনা সহ্য করতে না পারা, নিজেদের বেলায় হেকমতি উকিল আর অন্যদের বেলায় কঠোর বিচারকের ভূমিকা নেওয়া, অসহিষ্ণুতা, গালিগালাজ কিছুই তারা বাদ রাখছেন না। ওদিকে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করতে দলীয় আমিরকে সাধুপুরুষ বানিয়ে হাযির করেছেন। এটি অবশ্য নতুন নয়। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতের পরাজয়ের পর পরবর্তী সব নির্বাচনে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদূদীকে তারা এরকম সাধুপুরুষ বানিয়ে হাযির করেছিলেন। যদিও ফায়দা কিছুই হয়নি। একই কাজ এখন ডা. শফিকুর রহমানের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। এসব বাদ দিয়ে জামায়াত-শিবিরের ভাবা উচিত যে, এত সংঘবদ্ধ দল, এত আর্থিক সক্ষমতা, এত ডেডিকেটেড কর্মী ও ক্যাডার বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা কেন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নিরঙ্কুশ সমর্থন পাননি? কেন জামায়াত-শিবির এখনও অনেকের কাছে জুজুর নাম? কেন তারা অন্যান্য ইসলামী দল ও উলামা-মাশাইখের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন? ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে যাওয়া জামায়াত কেন বারবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আপোস করে নিজেদের দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে? দলীয় প্রান্তিকতা বাদ দিয়ে উম্মাহ-কেন্দ্রিক ভাবনা কখন আসবে জামায়াতের মধ্যে?

অন্যান্য ইসলামপন্থি গণতান্ত্রিক দলের মধ্যেও ইসলামী আদর্শের পাহারাদারি করার চেয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের একটি চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আলাপ থেকে দূরে গিয়ে তারা সেক্যুলার দলগুলোর বয়ান ধরেছেন। বর্তমান ধর্ম উপদেষ্টা, যিনি হেফাজতে ইসলাম ঘরানার লোক, মাদরাসার ছাত্রদেরকে পূজার সময় মন্দির পাহারা দেওয়ার কথা বলেছেন। হেফাজতের আরেক নেতা বলেছেন, হিন্দুরা যত ইচ্ছা মূর্তি তৈরি করুক, আমরা পাহারা দেব। গণঅভ্যুত্থানের পরপর অস্থিরতার সময় মাদরাসার ছাত্ররা মন্দির ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছেন। তখন এটি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটি কি মাদরাসার ছাত্রদের কাজ? মূর্তি, মন্দির এসবের সাথে ইসলামের যে বুনিয়াদি বিরোধ, তা ভুলে এখন আমরা মন্দির পাহারা দেব? আর মাদরাসার ছাত্রদেরকে যদি মন্দিরের নিরাপত্তা দিতে হয়, তাহলে রাষ্ট্র আছে কীজন্য? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে আজ বহু ইসলামের ছড়াছড়ি। তরুণ ইসলামী তাত্ত্বিকদের খিলাফতি ইসলাম, জামায়াত-হেফাজতের গণতান্ত্রিক ইসলাম, সমন্বয়কদের লোকায়ত নদীময় ইসলাম, মাযারপন্থি ইসলাম, মাযারবিরোধী ইসলাম, মন্দির-মূর্তি পাহারা দেওয়া সেক্যুলার ইসলাম। এতসব ইসলামের ভীড়ে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যায় কি না, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ওদিকে কতিপয় ইসলামপন্থি দল জামাতের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ড ও প্রোপাগাণ্ডায় কোনঠাসা হয়ে হতাশায় ভুগছেন। তাদের উচিত হতাশার বুদবুদ থেকে বের হয়ে আত্মসমালোচনা করা এবং নিজেদের আদর্শ ও অতীত অবদানকে সামনে এনে নিজেদেরকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। মনে রাখা উচিত, আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি কেবল রাজনৈতিক দল। কিন্তু একটি ইসলামী দল কেবল রাজনৈতিক দল নয়। রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক অঙ্গনেও তাদের দায় আছে। যারা রাজনীতিতে ক্ষণিকের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন, তাদের উচিত আপাতত কিছুদিনের জন্য কেবল ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে গুরুত্ব দেওয়া। অতীতে যেসব কাজ দিয়ে মানুষের কাছ থেকে তারা সম্মান কুড়িয়েছেন, সেসব কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার ফিতনা আবারও মাথাচাড়া দিচ্ছে, পাঠ্যবই সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটিতে নানা অসংগতি আছে। অতএব ইসলামী শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, পাঠ্যবইয়ে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে এমন বিশেষজ্ঞদেরকে সংশোধন কমিটিতে নিযুক্ত করা, অনৈসলামিক সংস্কৃতির আমদানি রুখে দেওয়া, দেশে দ্বীন ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ নানা ধর্মীয় ইস্যু রয়েছে, যা নিয়ে মাঠে সুসংহত আন্দোলন করে এসব কক্ষপথবিচ্ছিন্ন দল আবারও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। একইসাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক গুরুত্বকেও জানান দিতে পারে, যার ইতিবাচক ফলাফল ইতোমধ্যেই দেখা গেছে। এসব না করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে কেউ এসে কাউকে উদ্ধার করবে না। ফায়দা হয় আত্মসমালোচনার মাধ্যমে, ফায়দা হয় ভুল সংশোধনের মাধ্যমে, ফায়দা হয় আঘাতের পর পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামের সঠিক আকীদা পোষণ করা প্রতিটি ইসলামপন্থি দলেরই দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। এর জন্য প্রয়োজন হলো, সঠিক ধর্মীয়-রাজনৈতিক 'বয়ান' তৈরি করা, সমালোচনা সহ্য করার অভ্যাস করা, জন-আকাঙ্খাকে ঠিকমতো উপলব্ধি করা এবং সময়-সময় আত্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদের কক্ষপথ ঠিক রাখা। এতে করে ঘুরে দাঁড়ানো এবং অতীতের মতো দ্বীন ও জাতির খিদমত করা সম্ভব হবে।

নতুন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থা

মুহাম্মাদ আল জাওয়াহির খান



গত আগস্টের পাঁচ তারিখে স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশের কথা সকলের মুখে মুখে চর্চিত হয়েছে, তার সাথে এর আগের যে কোনো সময়ের পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। অল্প দিনের ব্যবধানে এতো বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যেহেতু এক দলীয় বা এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন চলছিল গণতন্ত্রের নামে, ফলে সে সময় মানুষের রাজনৈতিক অধিকারকে জঘন্য উপায়ে হরণ করা হয়েছিল। পাঁচ আগস্ট পরবর্তী সরকারের এই অল্প দিনের শাসনের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি থেকে শুরু করে নানা অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু জনগণের রাজনৈতিক অধিকারে যে বর্তমান সরকার মোটের উপর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করছে না, তা সকলেই স্বীকার করবেন। সাবেক স্বৈরাচারের দল ব্যতীত সকল দলমতের মানুষই তাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চার অবারিত সুযোগ পাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের রাজনীতিতে ইসলামপন্থার প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা নিশ্চয়ই মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইসলামপন্থার প্রতি রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে ৫ আগস্টের পর সারা দেশে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক পরিসরে ইসলামপন্থী সক্রিয়তার বৃদ্ধিও ঘটেছে, এমনকি ৫ আগস্ট সেনাপ্রধান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে দেশব্যাপী তুলনামূলক অধিক সংগঠিত ইসলামপন্থী সংগঠন হিসেবে জামায়াতের আমীরকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন, যে জামায়াত কিনা তার কয়েকদিন আগে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এসবই এই আদর্শের ধারকদের জন্য নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ বিষয়।

তবু দিন যত গড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে ইসলামপন্থীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ঠিকমতো ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন, স্বাধীনতাপরবর্তী এই অকল্পনীয় অনুকূল পরিবেশকেও রাজনীতির ময়দানে ইসলামপন্থার উত্থানে যথাযথরূপে কাজে লাগাতে পরছেন না। আগামীর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে এর পিছনের কারণসমূহ পর্যালোচনা অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে সবার আগে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা আলোচনার দাবি রাখে। জামায়াতে ইসলামী সারা দেশের সর্বত্র সংগঠনের দিক থেকে অন্য ইসলামী দল থেকে এগিয়ে থাকবে, এমনকি বিগত শাসনামলে তারা যে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন দাঁড় করিয়েছে, সেটির শক্তিমত্তাও রাজনীতি সচেতন কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। স্বৈরাচারী সংগঠনে যোগ

দিয়ে প্রকাশ্যে সেই সংগঠনের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নিজেদের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন দাঁড় করানোর বিষয়টি বেশ রোমাঞ্চকর বটে। কিন্তু ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন আর গণমানুষের সমর্থন সম্পূর্ণে ভিন্ন দুটি বিষয়। বাংলাদেশের ইসলামপন্থী তো দূরে থাক, যেকোনো আদর্শের রাজনৈতিক দলের তুলনায় জামায়াতের ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন অধিক বিস্তৃত, কিন্তু তাদের সেই সংগঠনে আলিম-উলামার অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম হওয়ায় গণমানুষের নিকট বিভিন্ন ঘরানার আলিম-উলামার যেই গ্রহণযোগ্যতা, সেটা তাদের না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ভিন্ন আদর্শের সংগঠনের ছদ্মবেশে নিজের সংগঠনের ক্যাডার গোছানো যতটা সহজ, সাধারণ জনগণকে নিজেদের দিকে টেনে আনা ততটা সহজ নয়, তদুপরি ধর্মভীরু বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত ইসলামপন্থার জন্য আলিম-উলামাকেই নিজেদের আদর্শ মনে করে, যাদের উপস্থিতি আবার জামায়াতের সংগঠনে তুলনামূলক কম।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য আলিম-উলামার সাথে জামায়াতের প্রশিক্ষিত ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকলে সামগ্রিকভাবে একটি ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারতো। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও বারবার মুখে বলাও হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী আলিমদের বিরুদ্ধে তারা তাদের প্রোপাগান্ডার মেশিনারি ব্যবহারে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। এমনকি ৫ আগস্টের পর জামায়াতের সাথে ঐক্য হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল, এমন অনেক ঘরানার আলিমদের বিরুদ্ধেও জামায়াতের প্রোপাগান্ডা মেশিনারি প্রচণ্ড সক্রিয় রয়েছে। ইসলামপন্থীদের মধ্যকার বিরোধ কোন নতুন বিষয় নয়, কিন্তু মুখে সেই বিরোধ ভুলে ঐক্যের কথা বলে আবার কার্যত সেই বিরোধের কারণে ভিন্ন মতাদর্শী আলিমদের পিছনে নিজেদের প্রোপাগান্ডা মেশিনারিকে শতভাগ সক্রিয় রাখলে তাতে ঐক্যের আহ্বানের আন্তরিকতা আর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিশ্চয়ই অবান্তর নয়।

জামায়াতে ইসলামী তাদের ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনের উপর ভর করে সাধারণ অবস্থায় দেশব্যাপী অনলাইন কিবা অফলাইনে; বিশেষত অনলাইনে নিজেদের অসাধারণ উপস্থিতি জানান দিতে সক্ষম হয়, যা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে এমন এক মনোভাব তৈরি হয়েছে যে, তাদের ধারণা এই মুহূর্তে ইসলামপন্থার একমাত্র কিংবা প্রধান প্রতিনিধি তারাই, তাদের একক আধিপত্যে অন্যান্য ইসলামপন্থীরা তাদেরকে সঙ্গ দিবেন। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি, ক্যাডারভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তিমত্তা সত্ত্বেও গণমানসের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে তারা কোনভাবেই শীর্ষে নেই, ফলে তাদের এই একাধিপত্য কায়েমের মনোভাব ঐক্যের প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

একক আধিপত্য যে শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে কায়িম করতে চায়, এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। আদর্শিক দিক থেকেও তাদের অবস্থান মূলত একই। এর ফলে তারা ঐক্য চায় ঠিকই, কিন্তু সেটা শতভাগ তাদের আদর্শের ভিত্তিতে। তারা ঐক্য চায়, কিন্তু যাদের সাথে ঐক্য চায় তাদের মতাদর্শ তাদের সাথে একটু তফাত দেখা দিলেই তারা আর ছাড় দিতে রাজি নয়। সর্বশক্তিতে তখন আবার সেই ভিন্নমতকে জনমানসে নেতিবাচকরূপে তুলে ধরতে সবধরনের প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়, এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের শক্তিমত্তার বদৌলতে অন্তত সামাজিক মাধ্যমে সেটা করতে আংশিক সফলও হয়।

৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সঙ্গত কারণেই স্বৈরশাসনামলে কার কী ভূমিকা ছিল, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও জামায়াতের বয়ান ও বাস্তবতার মধ্যে বিশাল তফাত। বিগত সরকারের আমলে জামায়াতের অসংখ্য নেতা-কর্মী বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা সেই সময়ের শাসকগোষ্ঠীর সাথে নানা রকমের সমঝোতায় পৌঁছায়। কোথাও কোথাও বাণিজ্যিক অংশিদারিত্বের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসায় রক্ষা যেমন করেছে, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় গোপন করে শাসক দলে যোগ দিয়ে নিজেদের কার্যক্রম নিরাপদে চালিয়ে গেছে। এতে তাদের সংগঠন ও সংগঠনের নেতাদের নিরাপত্তা কিছুটা হলেও নিশ্চিত হয়েছে। জানমালের নিরাপত্তার জন্য এমনটা না হয় করলো, কিন্তু মুশকিল হলো– তারা কেবল নিজেদের জানমালের হিফাযতের জন্য যা করেছে, তার বৈধতা দিলেও অপরদিকে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৃহত্তর স্বার্থে যে সকল ইসলামপন্থী বিগত সরকারের উপর যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং ইসলামের স্বার্থে সব সময় নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগাতেন, কোনো ধরনের ব্যক্তি স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও তারা এসকল ইসলামপন্থীদের স্বৈরাচারেরর দোসর হিসেবে অপবাদ দিচ্ছে। নিজেদের সংগঠন ও ব্যক্তি স্বার্থে আওয়ামীঘনিষ্ঠতা বৈধ হলেও ধারাবাহিকভাবে ইসলামের পক্ষে ভূমিকার রাখার জন্য যাদের সম্পর্ক ছিল, যারা কিনা কোন ধরনের ব্যক্তি স্বার্থে সে সম্পর্ক রক্ষা করেননি, তাদের বিরুদ্ধে তাদের যত অভিযোগ। এরকম অবস্থায় তাদের সাথে বৃহত্তর ইসলামপন্থীদের ঐক্য কিংবা তাদের হাত ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থার উত্থানের স্বপ্ন দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয় না।

তবে অন্যান্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে এর বাইরে অন্যান্য দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও কর্মসূচির দায়ও রয়েছে । বিশেষত প্রায় কোনো ইসলামী দলই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের জনগণের ভাষা পড়ে সে অনুযায়ী নিজেদের গোছাতে সক্রিয় হয়েছে বলে অন্তত এখনো মনে হচ্ছে না। আওয়ামীলীগের মতো একটি বড় দলের স্বৈরাচারী হিসেবে পতনের পরের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাদের অবস্থান ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে তাদের নিজেদেরও কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা আছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। একটি আপাদমস্তক সেক্যুলার রাষ্ট্রে স্বৈরাচারের পতন ঘটলেও সেটি শতভাগ ইসলামপন্থীদের অনুকূলে আসবে না, তা বলাই বাহুল্য। তদুপরি এ অভ্যুত্থানে ইসলামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকলেও কেবল তারাই একমাত্র অংশীজন নয়, বরং এর বাইরে আরো অনেক অংশীজন আছে এবং একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে অপরাপর অংশীজনের জন্য নিজেদের হিস্যা আদায় যতটা সহজ, ইসলামপন্থীদের জন্য ততটা সহজ হওয়ার কথা না। এই পরিস্থিতিতে যে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন তা দূরে থাক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির বিষয়ে ইসলামপন্থীদলগুলো যথেষ্ট সচেতন কিনা, তা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে ইসলামপন্থার জন্য বেশ অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিদ্যমান প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজেদের যথাযথ প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় ইসলামপন্থীদের প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০

rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট



রবীন্দ্র সাহিত্য ও বাঙ্গালি মুসলমান

সায়ীদ মানছুর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হুগলির শ্রীরামপুর মিশন থেকে আরবী-ফার্সী বর্জিত (যথাসম্ভব) সংস্কৃত শব্দবহুল আধুনিক বাংলার প্রচলন হয়। এই আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই সাহিত্যকে শিখরের অভিমুখে অগ্রসর হতে গতি সঞ্চার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসন অত্যুচে। তার কাব্য, সংগীত ও সাহিত্য তাকে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত করেছে। সাহিত্য বিচার মূলত রসবিচার। এই বিচারে রবীন্দ্র সাহিত্য নিশ্চয়ই নান্দনিক, তাই বলে রবীন্দ্র-আদর্শ সর্বোচ্চ প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সমস্যাজনক বিষয় হলো, তাকে সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচনাকে যথেষ্ট মনে না করে এখানে তাকে পূজনীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। উচ্ছ্বাসপ্রবণ রবীন্দ্রপ্রেমীরা রবীন্দ্রচিন্তা থেকে ছাঁচ আবিষ্কার করে বাঙ্গালিত্বের পরিচয় নির্ধারণ করার মতো মূঢ়তা প্রদর্শন করতেও দ্বিধান্বিত হন না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে শিল্পী হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ না করে দেবতা হিসেবে দেখার যে প্রচেষ্টা- সেটি নিশ্চয়ই আপত্তিকর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সাহিত্যে অখণ্ড হিন্দু ভারতের পক্ষে লিখেছেন। তিনি অকপটভাবে নিজের হিন্দু পরিচয় ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন- "আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তাতে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে"। এই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখেছেন- "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে, তা মেটাবার জন্য 'হিন্দু পরিচয়' বিসর্জন দিতে হবে এ কখনও সুস্থমস্তিষ্ক কল্পনা হতে পারে না। আর আমি হিন্দু নই বলিলেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী) হিন্দুত্বের প্রতি এমন নিখাদ আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাছবিচারহীনভাবে গ্রহণ করার পথকে স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত করে। তাছাড়া ঔপনিষদিক চেতনার সমাজব্যবস্থা পুনরুদ্ধার ও হিন্দু-অতীত পুনরুজ্জীবন চিন্তার পৌনঃপুনিক বিধৃতিসহ রবীন্দ্রসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশই মুসলমানের কৃষ্টি-কালচারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দীর্ঘ সংগ্রাম পরিক্রমায় বাঙ্গালি মুসলমান আজকে বাংলাদেশি মুসলমান পরিচয়ে উপনীত হয়েছে, তাই বিপরীত কোন সংস্কৃতি তাদের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা কোনভাবেই ন্যায্য নয়। অতএব হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্যানভাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালি সংস্কৃতির যে চিত্র এঁকেছিলেন, তাতে বাংলাদেশি মুসলমানের সংস্কৃতির স্থান কতটুকু ও কেমন, এটির পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ পোষিত সামন্তবাদী পরিবারে কৃষক-মজুর শোষণ ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠা আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত সামন্ত জমিদার। তিনি তার সাহিত্যে প্রজাশ্রেণির জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা-বিড়ম্বনা শিল্পময় সৌকর্যে উপস্থাপন করেছেন। ইউরোপীয় উদারবাদী ভাবধারার প্রতি তার অনুবর্তীতা এতে তাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি এই সমাজের যুলমমূলক ব্যবস্থার অবসান চাননি বলেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সাহিত্যে তিনি বলেছেন- "জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়। আমার মন উপরের তলার গদি ছেড়ে নিচে এসে বসেছে"। (প্রতীমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। উদ্ধৃতঃ রবীন্দ্র রচনাবলী) / তিনি বলেছেন- "জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে অন্তরের প্রবৃত্তি নেই"। (রায়তের কথা, কালান্তর) অথচ তার একান্ত সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী তাকে তার বিশাল জমিদারীর ক্ষুদ্র এক অংশ দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি তার পুত্র রথীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে বলেছিলেন- "বল কি হে অমিয়, আমার রথীন তাহলে খাবে কী?" (অন্নদাশঙ্কর রায়, 'রবীন্দ্রনাথ', প্রবন্ধ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা) দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে মানবদরদী চিন্তার পক্ষে ছড়ানো বাক্যজাল আর বাস্তবিক জীবনের ক্রিয়াকলাপে রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন থাকতে পারেননি। সুতরাং এমতাবস্থায় তার বাস্তব কর্মকাণ্ড যেন নিজের লেখাতেই দোষী না হয়, যেন তিনি নিজের লেখা ও ব্যক্তিগত অবস্থানের বৈপরীত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় না

হয়ে পড়েন, সে জন্য সর্বদা তাঁকে একধরণের কৌশলগত অবস্থান রক্ষা করে কথা বলতে হয়েছে। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ বা ঔপনিবেশিকতা, জমিদারি শোষণ ব্যবস্থা, উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়ের ব্যাপারে তিনি কথা বললে একধরণের ধোয়াশার ছড়াছড়ি করতে ব্যত্যয় ঘটাতেন না। তিনি শিল্পী হিসেবে এক, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে পুরোদস্তর বিপরীত আরেক। এই বিষয়টিরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তার প্রজাশ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলার মুসলমানকে পাত্তা না দেওয়ার মনোভাবে। সন্দেহ নাই যে রবীন্দ্রনাথ আপাদমস্তক শিল্পী, কিন্তু তার শিল্প এই অঞ্চলের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য চিত্রায়ণ করতে অসম্মত হয়েছে। এটা কোনো অঘটন নয়, বরং রবীন্দ্র মানসের গঠনই এমন ছিলো, যেখানে ইসলাম ও মুসলমানের তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান সতর্কভাবেই পুরোপুরি তিরোহিত। আবুল মনসুর আহমেদ এই বিষয়টিকে আক্ষেপের সাথে বর্ণনা করে বলেছেন-

"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আকাশে কতবার শরতের চন্দ্রোদয় হয়েছে, তাতে শারদীয়া পূজায় 'আনন্দময়ী মা' কতবার এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মুহাররমের চাঁদ উঠেনি। সে চাঁদ ওঠাবার ভার ছিল নজরুল ইসলামের ওপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কারণ এটা স্বাভাবিক। কাজেই কঠোর সত্য"। (বাংলাদেশের কালচার, আবুল মনসুর আহমদ)

ঢাকা কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'র অন্যতম সংগঠক, রবীন্দ্র প্রভাব বলয়ের আরেক কর্ণধার ও রবীন্দ্রমুগ্ধ সাহিত্যিক আবুল ফজলও রবীন্দ্রনাথের এমন একপক্ষীয় অবস্থানকে প্রশ্ন করেছিলেন। বাঙ্গালি মুসলমান রবীন্দ্র সাহিত্যে যেরকম দৃষ্টিকটূভাবে অন্তর্হিত ও অবহেলিত, এ ব্যাপারটি অন্য অনেকের মতো তাকেও পীড়িত করেছিল। আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন-

"বাঙলা সাহিত্যের অনির্বাণ ভাস্কর পর্যন্ত এ আধখানা বাঙলার দিকে ফিরে তাকাননি। রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙলার মাটির আঙিনায় রবির আলোকপাত হলো না। এর যথাযথ কারণ আমরা ধারণা করতে পারছি না। শুনেছি গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্পগুলো শিলাইদহে আপনাদের জমিদারিতে বসেই লেখা, শিলাইদহের মুসলমান প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আপনার কি আসন তা শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ না পড়েও আমরা আন্দাজ করতে পারি, অথচ এদের জীবন আপনার কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টার উপাদান হতে পারল না।" (সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, আবুল ফজল, চট্টগ্রাম)

স্বদেশী আন্দোলনের পরে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে হিন্দু কর্তৃক মুসলমানকে অচ্ছ্যুত/ম্লেচ্ছ ভাবার প্রচলন সহ মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুত্ব সহ লেখতে সচেষ্ট হয়েছেন, এটি স্বীকার্য। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এসব লিখেছেন হিন্দু সামন্তসমাজের জমিদারি হারানোর আর্থ-সামাজিক ক্ষতির আশংকার কারণে। স্বার্থহীন চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নিজের মত করে লেখেন, সেখানে তিনি এমনভাবে লেখেন যেন মুসলমানরা বাংলার সাথে সম্পৃক্ত কোন সমাজ নয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালি মুসলমান লেখকরা যদি মুসলমানী উপাদানকে সাহিত্যে উপস্থাপন করেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে সেটাকেও অননুমোদনের দৃষ্টান্ত অবিরল। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আধুনিক বাংলা কাব্যের পুরোধা এবং শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণের ভেদরহিত চেতনার কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অগাধ সম্মান করতেন এবং কবিগুরু বলে সম্বোধন করতেন। নজরুল তার সাহিত্য সৃষ্টিতে বাঙ্গালি মুসলমানের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব উপস্থিত করতে কার্পণ্য করতেন না। বিশেষত বাংলার মুসলমানের লোকভাষার যে ভাষিক স্বাতন্ত্র্য, নজরুল থেকে এর প্রতি কোন অবহেলা প্রকাশ পায়নি তো বটেই, বরং নজরুল সাহিত্যে এটি অত্যুচ্চ শৈল্পিক মূল্য অর্জন করেছে। কিন্তু এতে আপত্তি করে বসেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে, বাঙ্গালি মুসলমানের সংস্কৃতি কেন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ প্রেরণা হওয়া দরকার- এ ব্যাপারে নজরুলকে আলাদা করে স্পষ্টীকরণ করতে হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন- "কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর। এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য- সভায় ভিড় না করে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন গিয়ে।" (বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, নজরুলের প্রবন্ধ-সমগ্র)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানের জন্য কোন প্রেরণার জন্ম দিতে অসম্মত ছিলেন । তবে এটা তাঁর বড় কোন সাহিত্যিক ত্রুটি- এমনটা মনে করা জরুরি নয়, যেহেতু তিনি তার পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার এবং সেসবের প্রতিনিধিত্ব করার স্বাধীনতা রাখেন। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য যে বাঙ্গালী মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি ও মনোগঠনের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করেনি এবং এই সাহিত্যের গঠনকাঠামো যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির জনসমষ্টিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এটাকে কোনরূপ বিবেচনা না করে হিন্দু রাবীন্দ্রিক-মানস প্ররোচিত সংস্কৃতিকে এই দেশের মানুষের জন্য অনবদ্য হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশে যুগের পর যুগ ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটিই মূলত সমস্যার উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের মুসলমানের সাহিত্য তাদের স্বকীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চেতনা ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন- "এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গেছেন। তবু এ সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ কোনো প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে এ সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমান নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।" (বাংলাদেশের কালচার, আবুল মনসুর আহমদ)

ভারত যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ, তখন ব্রিটিশের সমর্থনপুষ্ট কলকাতার হিন্দু জমিদারদের অধীনে পূর্ব বাংলা ছিলো ব্রিটিশ-হিন্দুর দ্বৈত উপনিবেশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালি মুসলমান ছিলো জমিদারদের দ্বারা শোষিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথ এই সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি শোষণমূলক জমিদারি ব্যাবস্থার ফলে সৃষ্ট বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাহিত্যে এর চিত্রায়ণও করেছেন, কিন্তু তা উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা তিনি সতর্কভাবে এড়িয়ে গেছেন। তদুপরি সামন্তশ্রেণির শোষণ-পীড়ন থেকে উত্তরণের জন্য এখানকার মানুষজন ছোট-বড় যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তিনি সেগুলোকে একধরনের হুমকি হিসেবে দেখেছেন এবং কঠোরভাবে অসমর্থন করেছেন । তার এমন অবস্থান একাধিকবার আবরণহীন হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং এরই একটা উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের প্রচেষ্টায় তার সর্বাত্মক বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সময়ের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য জাত্যাভিমান ও ভেদজ্ঞানের যে স্বাক্ষর বিরাজিত ছিলো তা নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় এর বর্তমানের সমস্যা ও ভবিষ্যতের হুমকি নিয়ে ভাবার প্রয়োজনটুকু বোধ করেননি, বরং এসব সামাজিক অসঙ্গতির যে আশু-পরিণতি, এর প্রতিবিধান করার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনমানসে সঞ্চার হওয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনাকে প্রশ্রয় না দিতে তিনি তার ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীসত্তার যথাসম্ভব ব্যয় করে বাঙালি

মুসলমানের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।

আজকের বাংলাদেশে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের মোড়কে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভয়ংকর রূপ এখন অনেকটাই স্পষ্ট। কিন্তু এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক উপাদান কী, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অত্যন্ত জরুরি। বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না, বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই এদেশের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক কিবলা বা অভিমুখ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি ভাবার প্রবণতাটি সৈয়দ আলী আহসান চিহ্নিত করেছেন এবং এর ক্ষতির দিকটিও তিনি উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন- "আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে প্রথম যখন বাংলাদেশ হল তখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা আমরা কল্পনা করেছিলাম। সেই অন্তরঙ্গতা যে ভুল ছিল এটা ক্রমশ স্পষ্ট হল। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতের মেধা ও মনন পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি ভাবা অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক।" (বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ: আমাদের আত্মপরিচয়, সৈয়দ আলী আহসান)

তাছাড়া নিজেদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে নিজেদেরকে একই মালায় গ্রথিত করার প্রবণতাকেও সৈয়দ আলী আহসান নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন- "দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে একশ্রেণির অমেরুদণ্ডী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক আছেন যারা নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে বাঙালি বলে ঘোষণা দেন। এরা এক অর্থে মানসিক বিকারগ্রস্ত। কখনও কখনও নিজেদের বাঙালি বলেই ক্ষান্ত হন তাই নয়, তারা স্পষ্ট বলে থাকেন যে, তারা বাংলাদেশি নন, বাঙালি।" (বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ : আমাদের আত্মপরিচয়, সৈয়দ আলী আহসান)

বাংলাদেশের সংস্কৃতি নির্মাণের বেলায় পশ্চিমবঙ্গ পানে মুখিয়ে থাকা এবং ওখানকার সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ মোহমুগ্ধতায় ভোগা এখনো এখানকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পরিদৃষ্ট সাধারণ বাস্তবতা। আর সন্দেহাতীতভাবে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক প্রতিভূ হলেন রবীন্দ্রনাথ । অতএব এদেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বড় মাধ্যম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লাল বাতি জ্বলার দশা, তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত হয়েছিলেন। তিনি গীতাঞ্জলির অনুবাদ Song Offerings কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এই কাব্যগ্রন্থেরই ভূমিকা লেখক W.B. Yeats পরবর্তীতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত হওয়ার সত্যটিকে সামনে এনে বলেছিলেন- "A piece of wise imperialism from the English point of view". (উদ্ধৃত, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা, ফাহমিদ উর রহমান) বাংলাদেশে রাজনীতির আদর্শ হিসেবে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদকে নির্ধারণ করে ভারতীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করার যে দীর্ঘমেয়াদি ও বহুরূপী প্রচেষ্টা, এটাও করা হচ্ছে একই ব্যক্তিকে পুঁজি করে। তিনি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম বাঙ্গালি মুসলমানের সংস্কৃতির সাথে অপরিচয়ের দূরত্ব রক্ষা করে গড়ে উঠেছে। এই সাহিত্য উন্নত হতে পারে, কিন্তু একে অনধিকারে আপন সাহিত্য কল্পনা করা বাংলাদেশিদের জন্য নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। যে সাহিত্যে মুসলমানের কৃষ্টি-কালচার বর্জিত ও তাদের প্রগতির প্রেরণা তিরোহিত এবং যে সাহিত্য মুসলমানের প্রতি অবজ্ঞার প্রতীক দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত, সে সাহিত্য নিয়ে গৌরবান্বিত হওয়া চূড়ান্ত আত্মঘাতী, ফলতঃ হীনমন্যতা উৎপাদক। এমনকি এই ধরণের প্রচেষ্টা দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য উপকার তো বয়ে আনবে না, বরং এটি সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এক ধরণের অমৌলিকতা ও দেওলিয়াত্বকে স্বাগত জানাবে। আবুল মনসুর আহমদ যথার্থই অনুধাবন করে তার 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে বলেছেন- "বাঙলার মুসলমানও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড়ো হতে পারবে না । তাকে বড়ো হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিকে বুনিয়াদ করে।"

হদীসঃ

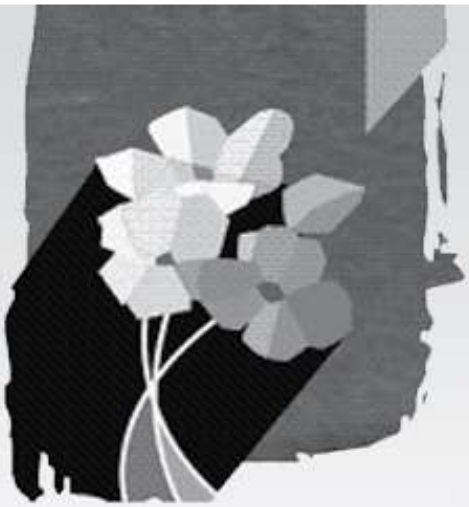
১. বাংলাদেশের কালচার, আবুল মনসুর আহমদ
২. বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া, এবনে গোলাম সামাদ
৩. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ - আমাদের আত্মপরিচয়, সৈয়দ আলী আহসান
৪. ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়— ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, সলিমুল্লাহ খান

প্রোপ্রাইটর
বেলাল আহমদ
০১৭৫২ ২৮১৯৪০
০১৭৩১-২৫৯০৪৭



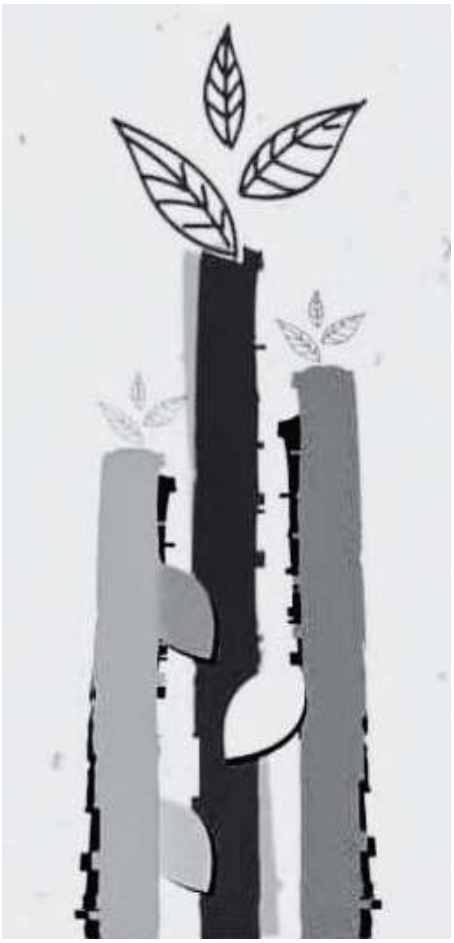
এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ন্যায্যমূল্যে পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

সিলেট মার্কেট, মহাজনপট্টি রোড, কালিঘাট, সিলেট



বহুবিবাহ: সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ইসলামী পরিপ্রেক্ষণ

মহসিন আহমদ



বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন, যার মাধ্যমে বৈধ ও সমাজস্বীকৃত পন্থায় পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারকে মানবসভ্যতা-ইতিহাসের প্রথম প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। আবার পরিবার গঠনের মাধ্যমেই সমাজ গঠিত হয়। অর্থাৎ, সমাজগঠনের ভিত্তি যেমন পরিবার, তেমনি পরিবার গঠনের পূর্ব:শর্ত হলো বিবাহ। বিবাহ প্রথার মাধ্যমে যেমন মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি মানবসমাজ-সভ্যতাও যুগ যুগ ধরে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সমাজ ও কালভেদে বিয়ের নিয়ম-কানুন ও প্রকার ভিন্ন হয়ে থাকে। বিয়ের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিয়ের অন্যতম একটি প্রকার বহুবিবাহ (Polygamy)। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, বহুবিবাহ বলতে একজন পুরুষ কর্তৃক একাধিক নারীকে কিংবা একজন নারীর একাধিক পুরুষকে বিয়ে করাকে বুঝায়। বহুবিবাহ তথা স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিয়ে আবার দু'প্রকার। যথা: এক. বহুপত্নী/বহু-স্ত্রী বিবাহ (Polygyny), দুই. বহুপতি/বহুস্বামী বিবাহ (Polyandry)। একজন পুরুষ কর্তৃক একাধিক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বহুপত্নী/বহু-স্ত্রী বিবাহ (Polygyny) বলা হয়। এ ধরনের বিয়ে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ (প্রায় সকল) সমাজেই এ ধরনের বিয়ের প্রচলন রয়েছে।

আর বহুস্বামী বিবাহ (Polyandry) বলতে একজন নারী কর্তৃক একাধিক পুরুষকে বিয়ে করা এবং একসাথে ঘরসংসার করাকে বুঝায়। এ ধরনের বিয়ের প্রথা পৃথিবীর কোথাও আদৌ ছিলো বা এখনও আছে কি না- এমন প্রশ্ন কোনো কোনো পাঠকের মনে জাগ্রত হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, বিরল হলেও এ ধরনের বিয়েও প্রাচীন কিছুসংখ্যক সমাজে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও কিছু উপজাতির মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়; যেমন দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, আফ্রিকার বাহিমা গোত্রসহ কতিপয় এস্কিমোদের মধ্যে এখনও এ বিরল প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু মূলধারার কোনো সমাজ কর্তৃক এ ধরনের বিয়ে স্বীকৃতি পায়নি এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মও এর অনুমোদন দেয়নি।

বহুপতি বিবাহ (একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকা) সমাজে স্বীকৃতি বা অনুমোদন না পাওয়ার পিছনে সমাজবিজ্ঞানীগণ অনেক কারণ উল্লেখ করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে প্রধান দু'টি কারণের প্রথমটি, পিতৃ-পরিচয় সংকট বা সামাজিক জটিলতা এবং দ্বিতীয়টি হলো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। বহুস্বামী বিবাহের (Polyandry) সামাজিক জটিলতার মধ্যে অন্যতম হলো, ঐ নারীর সন্তানের আসল পিতা কে- সেটা সনাক্ত করা যায় না এবং এজন্য সেই সন্তান পিতার সম্পদে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাসহ অন্যান্য সামাজিক জটিলতাও তৈরি হয়। আবার স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্য, একজন নারী একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে গেলে সে নারীসহ সবার বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন AIDS-সহ অন্যান্য STD (Sexually Transmitted Deseases) দ্বারা তারা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর কারণ

হলো, নারী-পুরুষের সম্পর্ককালে একজন পুরুষ হলো শুক্রাণু দাতা (Giver) আর নারী তা গ্রহীতা (Taker)। এক্ষেত্রে একজন নারী একই সময়ে একাধিক পুরুষ থেকে শুক্রাণু গ্রহণ করলে একদিকে যেমন গর্ভাশয়ে বংশবিস্তার তথা নতুন ভ্রুণ (Fetus) উৎপাদনে জটিলতা তৈরি হয়, অন্যদিকে AIDS, STD-এর মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ইসলাম এখানকার কোন ধরনের বিয়েকে অনুমোদন দিয়েছে? উত্তরটা নিশ্চয়ই সবার জানা যে, বহুপত্নী/বহু-স্ত্রী বিবাহ (Polygyny)। আর ইসলামে বহুবিবাহ (Polygamy) বলতে এ ধরনের বহুপত্নী তথা একজন পুরুষ কর্তৃক একাধিক (অনধিক চার) নারীকে বিয়ে করা বা করার অনুমোদনকে বুঝায়।

ইসলামে বহুবিবাহের অনুমোদন থাকায় এটাকে অনেকে অপছন্দ করে থাকেন, অনেকে আবার ঘৃণা করে থাকেন। অমুসলিমরা তো বিদ্বেষবশত এটার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা ছড়ায়ই, এমনকি কিছুসংখ্যক মুসলিমও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে থাকেন। এ-প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্বে প্রশ্ন রাখা হয় যদি, পৃথিবীতে ধর্ম/জীবনবিধান হিসেবে শুধু কি ইসলাম-ই বহুবিবাহের অনুমোদন দিয়েছে? উত্তর হলো, না। একেশ্বরবাদী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মেও বহুবিবাহের অনুমোদন আছে, অনুমোদন আছে বহু-ঈশ্বরবাদী সনাতন ধর্মেও। এমনকি সেসব ধর্মে যে বহুবিবাহের অনুমোদন আছে সেখানে নেই কোনো সীমাবদ্ধতা, নেই স্পষ্ট শর্তাবলি আর ইনসাফের বাণী। কিন্তু ইসলামে? খোদাপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ (Complete) ও সার্বজনীন (Universal) জীবনবিধান ইসলাম মানুষসহ সমাজের প্রকৃতি, প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য বহুবিবাহের অনুমোদন যেভাবে-যতটুকু দরকার ঠিক সেভাবে ততটুকুর অনুমোদন দিয়েছে।

ইসলামের আগমন-পূর্বকালে একজন পুরুষ অসংখ্য, এমনকি শতাধিক বিয়ে করতেন; বিশেষ করে শাসকগোষ্ঠি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শতাধিক বিয়ে করতেন। এতে তাদের বৈবাহিক জীবনে ন্যায়-ইনসাফ যেমন থাকতো না, তেমনি ছিল না সীমা-শৃঙ্খলাও। সেখানে ইসলাম শর্তাবলিসহ প্রয়োজন আর জরুরতের ভিত্তিতে বহুবিবাহকে নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ (সর্বাধিক চার) করে দিয়ে সমাজে শৃঙ্খলা যেমন প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি ন্যায়-ইনসাফও প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান রবের পবিত্র বাণী- তোমরা নারীদের মধ্য থেকে পছন্দানুযায়ী দুই, তিন, চারটি বিয়ে করো। কিন্তু ইনসাফ তথা সুবিচার যদি না করতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য একটি বিয়েই উত্তম। (সূরা নিসা, আয়াত ৩)

হ্যাঁ, বিয়ে একটিই উত্তম এবং একটি বিয়ের কথা কেবল কুরআনই বলেছে, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বলেনি। বরং সেসব ধর্ম স্পষ্ট ও ইনসাফপূর্ণ শর্তাবলি ছাড়াই যত খুশি তত বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের বিয়ের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সবাই জ্ঞাত, ১৬১০৮টি (মহাভারত)। এভাবে একেশ্বরবাদী খ্রীস্টান ও ইয়াহুদী ধর্মেও বহুসংখ্যক-শতাধিক বিয়ের নযীর রয়েছে দেখা যায়। যদিও বর্তমানে সেসব ধর্মের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বহুবিবাহের অনুমোদনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চলুন পূর্বের আলাপ 'ইনসাফ'-এ ফিরে যাই। ইসলাম পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমোদন দিয়েছে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে, যে শর্তগুলো সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বিশেষ করে নারীদের প্রতি। শর্তগুলো হলো- ১. বিয়ের পূর্বে বর্তমান স্ত্রীকে অবশ্যই জানাতে হবে। ২. নতুন স্ত্রীকে অবশ্যই জানাতে হবে যে তিনি পূর্বে বিবাহিত এবং তারপর যদি নতুন স্ত্রী সম্মত হন তাহলেই বিয়ে করা যাবে। ৩. সকল স্ত্রীর প্রতি অবশ্যই ন্যায্য আচরণ ও সুবিচার করতে হবে এবং অবশ্যই সবাইকে সবক্ষেত্রে সমান অধিকার দিতে হবে। ৪. সকল স্ত্রীর ভরণপোষণের সামর্থ্য অবশ্যই থাকতে হবে, অর্থাৎ আর্থিক সক্ষমতাও থাকতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা আবশ্যক যে, ইসলামে চারটি বিয়ের অনুমোদন আছে মানে প্রত্যেক পুরুষের চারটি বিয়ে করা নিয়ম, ফরজ বা বাধ্যতামূলক- এমন না এবং এটিকে উৎসাহিতও করা হয় না; বরং সাধারণ নিয়ম হলো একজন পুরুষ একটি বিয়েই করবে, যেটা আর কোনো ধর্ম উল্লেখ করেনি। প্রয়োজন আর জরুরতের ভিত্তিতে ব্যতিক্রম ও ঐচ্ছিক নিয়ম হলো, উপরোল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে এবং সমাজের বৃহৎ স্বার্থে বহুবিবাহের (অনধিক চার) অনুমোদন বা অনুমতি আছে। এজন্য আমাদের চারপাশে বহুবিবাহের উদাহরণ দেখা যায় না, ব্যতিক্রম ছাড়া।

যারা মুসলিমদের বহুবিবাহের অনুমোদনকে তীর্যক চোখে দেখেন, ইসলামে বহুবিবাহ অনুমোদন মানেই মুসলিমরা বহুবিবাহ বেশি করে থাকেন বলে মনে করেন, তাদের জেনে রাখা দরকার যে মুসলিম সমাজেই বহুবিবাহের হার তুলনামূলক কম। এ প্রসঙ্গে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্র ভারতের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৪ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে যেখানে বহুবিবাহের হার যথাক্রমে ৫.৮%, ৭.৯%, ৬.৭% ও ১৫% (শতাংশ) ছিলো; সেখানে মুসলিমদের মধ্যে বহুবিবাহের হার ছিলো তাদের থেকেও তুলনামূলক কম- ৫.৬% (Razvi, S. 2018 May 5. Polygamy in Hindu Dharma. Website: VedKaBhed)। অথচ এরও প্রায় দুই দশক পূর্বে ভারতে 'হিন্দু বিয়ে আইন ১৯৫৫' দ্বারা বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, ইসলাম কেন এই ঐচ্ছিক বহুবিবাহেরই অনুমোদন দিয়েছে, কেন বহুবিবাহকে একেবারে নিষিদ্ধ করেনি? এজন্য 'ইসলাম কী' সেটা অথবা ইসলামের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য আরেকবার স্পষ্ট করা দরকার। ইসলাম হলো রাব্বুল আলামীন আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ (Complete) জীবনবিধান এবং এর একটি গুরুত্বপূণ বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা (Universality)। অর্থাৎ, ইসলাম সর্বকাল, সর্বযুগ আর সর্বসমাজের জন্য উপযোগী জীবনবিধান, যার মৌলিক আইন-নিয়ম-নীতিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষসহ সৃষ্টিজগতের প্রকৃতি, স্বভাব ও কীসে তাদের কল্যাণ সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। তাই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের প্রতিটি বিধানকেও হতে হয় যেমন সর্বোচ্চ কল্যাণকর, তেমনি কালোত্তীর্ণ, সর্বযুগে উপযোগী তথা সার্বজনীন (Universal)। আর এজন্যই, এই উদ্দেশ্যেই মানবসমাজের স্বভাব, প্রকৃতি ও বৃহৎ কল্যাণের নিমিত্তে ইসলাম বহুবিবাহকে একেবারে নিষিদ্ধ না করে বরং শর্তসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট বিধানসহ অনুমোদন দিয়েছে। চলুন বহুবিবাহ অনুমোদনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যকারণ ও এর যৌক্তিকতা সংক্ষেপে দেখি।

নারী-পুরুষের সংখ্যাগত তারতম্য

পরিসংখ্যান মতে, পুরো পৃথিবীব্যাপী পুরুষের চেয়ে গড়ে নারীর সংখ্যা বেশি ছিল এবং এখনও আছে (যদিও বর্তমানে গর্ভের সন্তান নারী জেনে বিপুলসংখ্যক ভ্রুণকে নষ্ট করা হয়)। সমাজ বিশ্লেষকদের তথ্যমতে, পৃথিবীতে প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ১০০৫ জন নারী রয়েছেন। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, নারীশিশু থেকে পুরুষ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় শৈশবে ছেলেশিশুদের মৃত্যুহার বেশি; যুদ্ধ-বিগ্রহে নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশিসংখ্যক নিহত হওয়া; সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো পুরুষরা বেশি করায় এবং অস্বাস্থ্যকর নানান নেশাতে তাদের অধিকসংখ্যক আসক্ত থাকায় পুরুষদের মৃত্যুহার বেশি থাকে; এছাড়া এসব কারণে নারীদের গড় আয়ুও প্রায় পুরো পৃথিবীব্যাপী পুরুষদের চেয়ে বেশি। আর এজন্যই বহুবিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যাতে প্রতিটি নারীর নিরাপদ আশ্রয়স্থলের নিশ্চয়তা থাকে, পরিবার থাকে, থাকে প্রত্যেকের জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধ পন্থা।

সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষা

অনেক নারী বন্ধ্যা বা সন্তান জন্মদানে অক্ষম থাকেন। এক্ষেত্রে স্বামীর যদি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে যাতে পূর্বের স্ত্রীকে

তালাক না দিয়েই নতুন স্ত্রী গ্রহণ করা যায় সেজন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও তথা বহুবিবাহের সর্বক্ষেত্রেই স্বামীকে সকল স্ত্রীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার শর্তসহ অন্যান্য শর্ত পালন করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, যদি স্বামী সন্তান জন্মদানে অক্ষম থাকেন তাহলে স্ত্রী কি পারবেন আরেকটি বিয়ে করতে? উত্তর হলো, হ্যাঁ, পারবেন; তবে পূর্বের স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র নতুন কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হবেন। ইসলামে একইসময় একইসাথে একজন নারীর একাধিক বিয়ের অনুমোদন নেই। কেন নেই- সেটার যৌক্তিকতাও সবার জানা, এছাড়া চলমান নিবন্ধেও খণ্ডখণ্ডভাবে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জৈবিক চাহিদা

চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্যমতে, কোনো কোনো পুরুষের জৈবিক চাহিদা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আবার নারীদের নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতাও থাকে। এছাড়া নির্দিষ্ট বয়সের পর নারীদের জৈবিক চাহিদা কমে গেলেও পুরষের সে চাহিদা অটুট থাকে। এজন্য এসব ক্ষেত্রে নৈতিক সীমারেখা আর স্ত্রীগণের প্রতি সুবিচারসহ অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এতিম ও বিধবা বিবাহ

সমাজে সবসময়ই দেখা যায় এতিম ও বিধবা নারীগণ সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা ও অবহেলিত। তাদেরকে, বিশেষ করে বিধবা নারীকে বিয়ে করা কোনো কোনো সমাজে অবৈধ, অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক মনে করা হয়। এমনকি হিন্দুস্তানে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় বিধবা নারীদের সতীদাহ তথা জীবন্ত সহমরণ বরণ করতে হতো। এছাড়া তারা কোনো-না-কোনো বিবাহিত পুরুষের আত্মীয়ও হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় সেসব অসহায় এতিম ও বিধবা নারীকে যদি দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সম্মান, মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে কোনো পুরুষের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তাহলে সেটাই যে অধিক উত্তম পন্থা- এ বিষয়ে কারো দ্বিধা-দ্বিমত থাকার কথা নয়।

নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ও সামাজিক অবক্ষয়রোধ

সমাজ বিশ্লেষকদের তত্ত্বমতে, বহুবিবাহের অনুমোদন না থাকার ফল হবে অবশ্যম্ভাবী সামাজিক অবক্ষয়। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীব্যাপী নারীদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। এ সংখ্যাধিক্য নারীদের জন্য যদি সমাজস্বীকৃত বিবাহের ব্যবস্থা না থাকে বরং সমাজ যদি একবিবাহের আইন করে, তাহলে তাদের জৈবিক চাহিদা-কামনা পূরণের পন্থা অপরিহার্যভাবে অসামাজিক আর হারাম হবে। অর্থাৎ, তখন পতিতাবৃত্তি, দেহ-ব্যবসা, ব্যভিচার বাড়বে আর অবৈধ বহুগামিতা-সমকামিতার মতো অনেক অনাচারের পথ প্রশস্থ হবে। ফলশ্রুতিতে যেমন সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হবে, তেমনি সমাজ-সভ্যতার পতনের পথও তরান্বিত হবে। আর এজন্যই ইসলাম সামাজিক অবক্ষয়রোধ ও নৈতিক চরিত্রের সংরক্ষণের নিমিত্তে নির্দিষ্ট সীমারেখা ও শর্তসহ বহুবিবাহের (সর্বাধিক চার) পথ খোলা রেখেছে, তবে মনে রাখবেন, বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন বা সংশয় হতে পারে, ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের সূচনাকাল থেকে গত শতাব্দি পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহসহ অন্যান্য কারণে হয়তো পুরুষদের মৃত্যুহার বেশি ছিলো। কিন্তু এই একুশ শতাব্দিতেও কি নারীদের সংখ্যা বেশি? এক্ষেত্রে ইউরোপের কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যায়; যেমন রাশিয়া, ইউক্রেন আর লাটভিয়ায় ১০০ জন পুরুষের তুলনায় যথাক্রমে নারীর সংখ্যা ১১৫.৩, ১১৫.৮৭ ও ১১৮.০ জন (৬ দেশে পুরুষ সংকট, মিলছে না বিয়ের পাত্র; ২০২১, জানুয়ারি ২৫; দৈনিক আমার সংবাদ)। এমনকি আফ্রিকার দেশ ইরিত্রিয়া নারীর সংখ্যাধিক্যের কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুষদের উপর দুই বিয়ে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে (All roads lead to Eritrea for alleged `two wives offfer'. 2020, January 08. The Africa news)।

এভাবে ইসলামে বহুবিবাহ অনুমোদনের আরও অনেক কারণ উল্লেখ করা যেত, কিন্তু চলমান নিবন্ধের কলেবর মাত্রাতিরিক্ত বাড়ার আশঙ্কায় আনাড়ি হাতের শব্দসংখ্যা আর বাড়াচ্ছি না। পরিশেষে আবারও উল্লেখ করছি, ইসলাম বহুবিবাহের উদ্ভাবন বা প্রচলন করেনি আর মুসলিমদেরকে বহুবিবাহের প্রতি উৎসাহিতও করেনি; বরং মানুষের স্বভাব, প্রয়োজন আর আবশ্যকতার ভিত্তিতে বহুবিবাহের দ্বার খোলা রেখেছে। তাছাড়া মানুষসহ সমাজের কল্যাণে বহুবিবাহকে সুনির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ আর সুনিয়ন্ত্রিত করাসহ এর সাথে ইনসাফপূর্ণ শর্তাবলি যুক্ত করে মানবসমাজের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী উপকারী ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-উদাহরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এভাবে সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায় আর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান

সিরাজাম মুনিরা লতিফিয়া মাদরাসা

SIRAJAM MUNIRA LATIFIA MADRASAH

স্থাপিত: ২০২৪ইং

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিফযুল কুরআন।
* হিফজের পাশাপাশি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* নাহু সরফ বিষয়ে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা।
* ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা সমন্বিত সিলেবাস।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* অনলাইনের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার দ্বারা বিশেষ পাঠদান।
* সুন্নাতে নববীর অনুসরণ ও উত্তম চরিত্রের উপর গুরুত্বারোপ।
* সুন্দর মননের জন্য সাপ্তাহিক সভা, বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস উদযাপন।
* গরীব, ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।
* সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

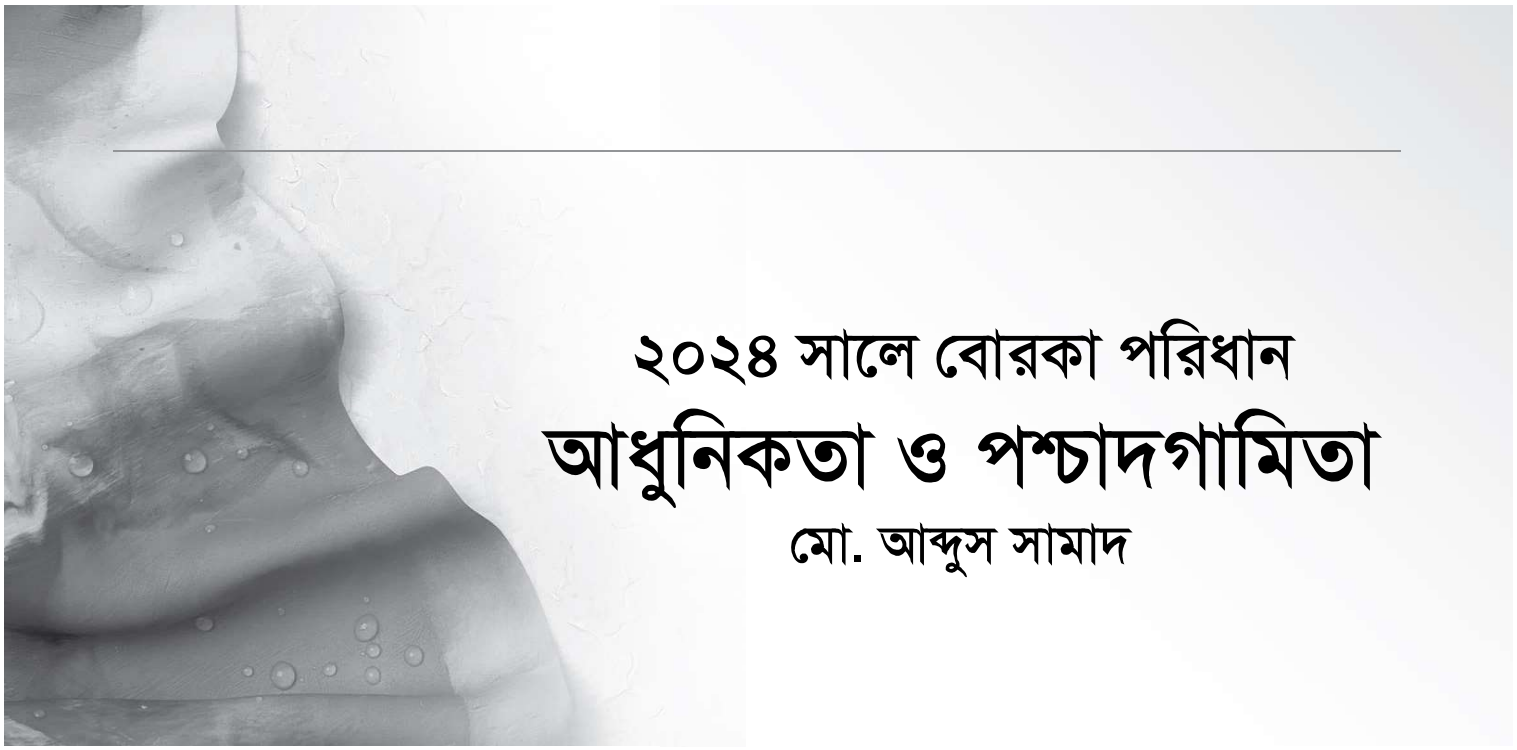
আবাসিক অনাবাসিক

ভর্তি চলছে

যোগাযোগ

মাওলানা মো: ইয়াকুব আলী
প্রিন্সিপাল
মোবাইল: 01715-526279

সোনাপুর, কালেঙ্গা রোড, মৌলভীবাজার সদর। মোবাইল: ০১৩১৮-৫২৮২৫৭



২০২৪ সালে বোরকা পরিধান
আধুনিকতা ও পশ্চাদগামিতা

মো. আব্দুস সামাদ

শিল্পকলা একাডেমির সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল দিন কয়েক আগে একটা বক্তব্যে প্রশ্ন তুলেছেন, "২০২৪-এ এসেও কেন বোরকা পরতে হবে?" খন্ডিত এ উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম আলোচনা সামাজিক মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখিত উক্তিটি মূলত দুটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করে- এক. ২০২৪ (সময়), দুই. বোরকা পরা। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ব্যাপার (বোরকা পরা) একটি নির্দিষ্ট সময়ে (২০২৪-এ) কতোটা মানানসই- মূলত সে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । এর বাইরেও আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে, সেটা হলো 'সময়'-এর পাশাপাশি 'ভৌগোলিক অবস্থান'। আরও সহজ কথায়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কেন বোরকা পরতে হবে- এরকম। তাহলে এখানে সর্বমোট তিনটা বিষয় দাঁড়ায়- বোরকা পরা, বাংলাদেশ ও ২০২৪ (সাল)।

আমরা মূলত পাশ্চাত্যের কাছে পরাজিত (Culturally, Politically & Economically)। তাই তাদের সবকিছু আমাদের কাছে অনুকরণীয়! আমাদের বিজিত ক্ষমতাবান গোষ্ঠী (Ruling Elite) রাজনীতি থেকে অর্থনীতি সব জায়গায় বিজয়ী পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে থাকে। বিজয়ীর প্রতি বিজিতের এমন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুন এই বিষয়টা প্রায় ৬০০ বছর আগে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর মতে, "বিজিত সব সময়ই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বিজয়ীকে তার প্রতীক, পোশাক, বিশ্বাসসহ সমস্ত অবস্থা ও প্রথায় অনুসরণ করতে চায়।" বিজয়ীদের সব কিছু পরিপূর্ণ- "এই ভুল ধারণা একসময়ে বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং বিজিত বিজয়ীর সমস্ত বিশ্বাস পরিগ্রহ করে নেয় এবং অনুকরণ করা শুরু করে।" (খালদুন,)

পাশ্চাত্যের সবকিছু পরিপূর্ণ (perfect)- এই ভুল ধারণা বাংলাদেশের মতো তাদের সব উপনিবেশগুলোর কাছে বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা কালো হয়েও সাদাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে অনুকরণ করতে থাকি (ফ্রানোর 'Black Skin, White Mask', ১৯৫৬)। একারণে বোরকা পরার বিষয়টা তথাকথিত আধুনিক, সভ্য, বিজয়ীদের সমাজে অনুপস্থিত বলে আমাদের অনেকের কাছে এটাকে পশ্চাদগামিতা মনে হয়।

সমাজবিজ্ঞানী বাউম্যানের মতে, জাতীয়তাবাদের মধ্যে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী (Ruling Elite) সাংস্কৃতিক আধিপত্যের (Cultural Hegemony) মাধ্যমে আমজনতার সাথে ঐক্য এবং সেইসাথে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার প্রয়াস পেয়ে থাকে। যারা আমজনতাকে Cultural Hegemony'র মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায় এবং নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করে তারা আবার বিজয়ীদের সবকিছু অনুকরণ করে সেটা বাকিদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমজনতা বিজিত হওয়া স্বত্তেও ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক কারণে সেটা মানতে নারাজ থাকে। সেকারণে জামিল সাহেবের মতো যারা অতি-আধুনিক তথা ২০২৪ সালে এসে বোরকা পরাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে বিজয়ীদের মতো আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদেরকে আমজনতা গ্রহণ করছে না।

পশ্চিমা-বহির্ভূত সবকিছুকে বিজয়ী তথা উপনিবেশবাদীরা অপরায়ণের (Othering) মাধ্যমে নিজেদেরগুলোকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে থাকে। যেমন: তারা ধারণা করতো যে হিজাব পরিহিত নারীরা নির্ভরশীল, নির্যাতিত এবং বিদ্রোহের অনুপযুক্ত । কিন্তু আলজেরিয়ার নারীদের উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ সেটাকে ভুল প্রমাণিত করে দেয়। ফ্রানজ ফানোঁ মনে করেন, এদের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যাতে আলজেরিয়ার পুরুষরা তাদের পশ্চাৎপদ সমাজের জন্য লজ্জিত হয় আর উপনিবেশবাদীরা আলজেরীয় সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ পায় এবং তাদের মতাদর্শানুযায়ী নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। জামিল সাহেবরাও একইভাবে এটা মনে করেন যে, ২০২৪ সালে যারা বোরকা পরিধান করে তারা পশ্চাদপদ সমাজে বাস করে। অথচ যারা বোরকা/হিজাব/নিকাববিরোধী তারা চিন্তাগত দিক দিয়ে পশ্চিমের গোলামী করে এবং পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণাধীন এক সাংস্কৃতিক আধিপত্য আমজনতার উপর বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আমজনতা এসব গ্রহণে অনেকসময় অনীহা প্রকাশ করায় তারা হরহামেশাই হতাশ হয়। ফ্রানোর ভাষায় বলা যায়, "The women who sees without being seen frustrates the coloniser."

'আধুনিক' শব্দটা শুনলে বা দেখলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে ইউরোপের চিত্র। কোনো কিছু আধুনিক মানেই সেটা পশ্চিমা কায়দায় হতেই হবে। ইউরোপের রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি আমাদের কাছে আধুনিকতার 'আদর্শ নমুনা' (Ideal Type, Max Weber) হয়ে গেছে। এর বাইরের সবকিছু 'পশ্চাদপদ' মনে হয়। ইউরোপীয় আধুনিকতার একটি নির্দিষ্ট রূপ আমাদের মনে গেঁথে আছে। তাই বর্তমানে আধুনিকতার সবচেয়ে বিকশিত রূপ দেখতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হয় ইউরোপের দিকে। সেটা করতে

গিয়ে স্বভাবতই অ-ইউরোপীয় সমাজ নিজেদেরকে 'অবিকশিত', 'অসম্পূর্ণ' ও 'সীমাবদ্ধ' হিসেবে দেখে হীনমণ্যতায় ডুবে থাকে। এসব সমাজের 'লুকিং গ্লাস সেল্ফ'-এর (অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা) লুকিং গ্লাসটা হয়ে গেছে ইউরোপীয় সমাজ! অথচ আধুনিকতা সর্বজনীন বিষয় নয় (Modernity is pluriversal)।

'নিম্নবর্গের ইতিহাস' (Subaltern Studies)-এর প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ভারতীয় ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. দীপেশ চক্রবর্তী ইউরোপের 'সর্বজনীনতা' (Universality)-কে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। প্রফেসর দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর 'Provincialization of Europe' বইটিতে ইউরোপীয় আধুনিকতার সর্বজনীনতাকে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি আধুনিকতার বহুত্বের ধারণা তুলে ধরেছেন। ড. চক্রবর্তী 'ইউরোপ'কে নেহাত ভূখন্ড হিসেবে না দেখে একটা 'মনস্তত্ত্ব' বা 'মানসিক প্রবণতা' (Mindset) হিসেবে দেখেছেন। সেই 'মনস্তত্ত্ব'কে পৃথিবীর প্রধান 'মনস্তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পায়তারা খুঁজেও পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি 'ইতিহাসের বিশ্রামাগার' (Waiting Room of History) নামে এক অভিনব ধারণা উপস্থাপন করেছেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আধুনিকতার স্তম্ভ বা পূর্বশর্তগুলো (Prerequisites) যেমন- মানবাধিকার, আদর্শ রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় ('Social Justice') ইত্যাদি ইউরোপ ছাড়া বাকি পৃথিবীতে অনুপস্থিত। ফলে আধুনিক হওয়ার দৌড়ে তারা পিছিয়ে আছে। সেই পূর্বশর্তগুলো অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে পড়াদের একটি কল্পিত 'বিশ্রামাগারে' অপেক্ষা করতে হবে। বিষয়টা অনেকটা এরকম- আধুনিক হয়ে উঠেনি এমন সমাজ 'আধুনিক'গামী ট্রেনে যাত্রা করবে, কিন্তু সেই ট্রেনে যাত্রা করার পূর্বশর্তগুলো অর্জন না হওয়া (যোগ্য না হওয়া) পর্যন্ত স্টেশনের Waiting Room-এ অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমান সময়ে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতিতে যে আধুনিকতার ঝড় উঠেছে সেটা ঐ Waiting Room-এ অবস্থিত ইউরোপীয় আধুনিকতাগামীদের কলরব।

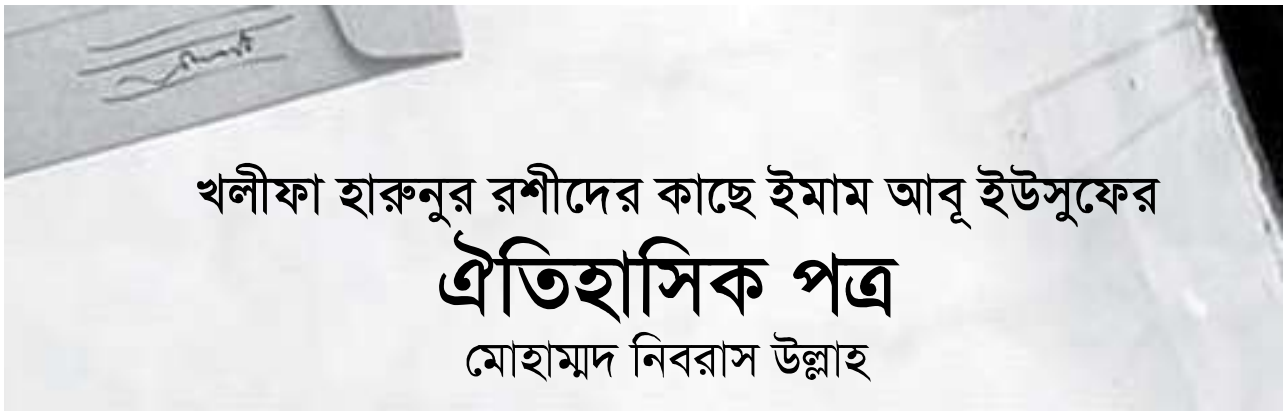
কিন্তু প্রফেসর দীপেশ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে ইউরোপই আধুনিকতার একমাত্র গন্তব্য না। আধুনিক বিভিন্নভাবে হওয়া যেতে পারে, বিকল্প আধুনিকতাও হতে পারে। তিনি এই বিষয়টি তাঁর 'Diverse Ways of Being Human/World' ধারণাটির মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। যেমন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'- এক্ষেত্রে মানুষ কি শুধু ইউরোপের তথা সাদা চামড়ার মানুষ, না অন্যরাও? আবার মানুষ হতে হলে ইউরোপীয়দের মতো হতে হবে, নাকি অনেকভাবে মানুষ হওয়া যায়? উত্তর হলো সাদা-কালো সবাই মানুষ এবং অবশ্যই অনেকভাবে মানুষ হওয়া যায়। আধুনিকতা বিষয়টাও এমন আর অনেকভাবে হওয়া যায়। এই অনেকভাবে হতে পারার বিষয়টাকে প্রফেসর চক্রবর্তী 'Diverse Ways of Being Human/World' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু জামিল সাহেবরা মনে হয় এ ব্যাপারে খুব জোরালোভাবে দ্বিমত পোষণ করেন।

জামিল সাহেব তাঁর বক্তব্যে ২০২৪ তথা সময় (বর্তমান) নিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিষয়টা অনেকটা এরকম যে ২০২৪-এ আর 'বিশ্রামাগারে' বসার অপেক্ষায় থাকার সময় নেই, বরং 'আধুনিকতা' গামি ট্রেনে উঠার সময় হয়েছে। এই সময়ের আধুনিকতার প্রশ্নেও প্রফেসর দীপেশ চক্রবর্তী প্রাসঙ্গিক। তাঁর 'Provincialization of Europe' বইয়ে সময়ের (বিশেষত বর্তমান) আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, ইতিহাস কোনো ধারাবাহিক বা স্তরে স্তরে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া না। অর্থাৎ, পৃথিবীর সব সমাজ একই প্রক্রিয়ায় একেকটা ধাপ পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে, এমন না আর বর্তমান হলো একটি সময়গ্রন্থি (Time Knot) যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জট পাকানো একটি অবস্থা।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে বোরকা পরিধান করাটা জামিল সাহেবদের কাছে পশ্চাৎপদতার নির্দেশক হলেও বাস্তবে তা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তথা অতীত ও স্থানিকতার (বাংলাদেশ) নির্দেশক; বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের প্রতিবন্ধক নয়। মূলকথা, আধুনিকতা যে সারা দুনিয়ায় একইভাবে হবে বা সবাই ইউরোপীয়ানদের মতো একই প্রক্রিয়ায় আধুনিক হবে- এই বিষয়টি বিজয়ী তথা উপনিবেশবাদীদের প্রতি আমাদের ভুল ধারণা আর অন্ধ অনুকরণ থেকেই কেবল বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে (যেমনটা ইবন খালদুনও বলেছিলেন)।

জামিল সাহেব তাঁর বক্তব্যে পুরুষের চোখ সংযমকে বোরকা পরার বিকল্প হিসেবে দেখেছেন। "বোরকার কথাটাই প্রকাশ করলেন। পুরুষের চোখ সংযত করার কথাটাকে বোরকা পরিয়ে ঢেকে দিলেন!" -জামিল সাহেবের সমালোচনার বিপরীতে এমন প্রতিক্রিয়াও সামাজিক মাধ্যমে চোখে পড়েছে অনেকের। জামিল সাহেবের পক্ষাবলম্বন করেই হোক কিংবা নিজেকে একটু আধুনিক দেখানোর জন্যই হোক, যারা এমনটা বলছেন তাদেরও ত্রুটি আছে। তারা আসলে 'পরিপূরক' ও 'প্রতিস্থাপক' এ দুটা বিষয়কে এক করে গুলিয়ে ফেলছেন। পুরুষের চোখ সংযত রাখা নারীদের বোরকা পরার পরিপূরক, প্রতিস্থাপক না; অর্থাৎ, চোখ সংযত করা বোরকা পরাকে প্রতিস্থাপন করে না। আবার পুরুষের চোখের সংযমের কথাটা যেভাবে ঢালাওভাবে প্রচার করা হয়েছে যেন ধর্মে নারীর দৃষ্টির সংযমের কথা নেই একেবারেই। অথচ কুরআনে নারী-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টি সংযমের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "(হে নবী!) বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন তারা যেন নিজদের দৃষ্টিকে শালীন রাখে, লজ্জাস্থান ঢেকে চলে এবং যৌনাকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখে। এটি তাদেরকে শুদ্ধাচারী করে তুলবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল (সূরা নূরা: ৩০)।" আবার পরের আয়াতটা দেখুন, "(হে নবি!) বিশ্বাসী নারীদের বলুন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে শালীন রাখে, লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে রাখে এবং যৌনাকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখে (সূরা নূর:৩১)।" পুরুষ ও নারী উভয়ের দৃষ্টি সংযমের ব্যাপারে নির্দেশনা একই কিন্তু সৌন্দর্য ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে নারীদের আরও নির্দেশনা রয়েছে । আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে, "সাধারণভাবে যা প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য যেন জনসম্মুখে প্রকাশ না করে (সূরা নূর: ৩১)।"

পরিশেষে জামিল সাহেব ও তথাকথিত আধুনিকতার বাহকদের উদ্দেশ্যে এতটুকু বলা যায়, দেখেন, আপনারা যে ইউরোপীয় কায়দায় আধুনিক হওয়ার জন্য 'Waiting Room' (of History)-তে বসে শারীরিকভাবে কাক (imposed! i.e. 'Black Skin) হয়েও বাহ্যিকভাবে বক (White Mask) হওয়ার মাধ্যমে আধুনিক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ভাবছেন যে ২০২৪-এ এসে এখন আর বোরকা পরিধানের দরকার নাই, বোরকা পরিধান করা পশ্চাদপসরণ বা আধুনিকতার প্রতিবন্ধক- এমন ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। এছাড়া এভাবে বিজয়ী উপনিবেশবাদীদের আধুনিকগামী ট্রেনে উঠার অপেক্ষায় 'বিশ্রামাগারে' বসে থাকলে যে উপনিবেশবীদের স্বার্থই সিদ্ধি হচ্ছে, সেটাও ভাবা দরকার। কেননা তাদের যেভাবে উপনিবেশ ছিলো সেভাবে আপনাদের নেই, তারা যেভাবে দুনিয়া থেকে লুটপাট করে পুঁজি সংগ্রহ করেছে বর্তমানে আপনাদের জন্য সেটা অসম্ভব; অধিকন্তু তাদের মতো Plundering without danger (PWD) আপনারা পারবেনও না। তাই তাদের মতো একই প্রক্রিয়ায় আপনারাও আধুনিক হতে পারবেন না । সুতরাং, সারা দুনিয়ায় ডেভেলপমেন্ট হবে Rostwo-এর 'Development Model' অনুসরণ করে আর আধুনিক হবে Talcott Parson-এর 'Modernization Theory' অনুযায়ী- এমন ভাবনা না ভেবে আমাদের উচিত 'Waiting Room' থেকে বের হয়ে আসা এবং 'Diverse Ways of Being...'-এর কথা ভেবে নিজেদের মতো আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করা।



খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে ইমাম আবূ ইউসুফের

ঐতিহাসিক পত্র

মোহাম্মদ নিবরাস উল্লাহ

অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলাও উত্তম জিহাদ। এটা মহানবী ﷺ এর একটা পবিত্র হাদীস। যুগে যুগে উলামায়ে হাক্কানী এই মহান আদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে নানা নির্যাতন উৎপীড়ন ভোগ করেছেন। শাসকরা তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালিয়েছেন, কিন্তু হাক্কানী আলিম সমাজকে সত্যকথা প্রচারে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। আমাদের মহান ইমাম ফকীহগণের জীবনী পাঠ করলে সত্যভাষণের অসংখ্য কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় এরকমও দেখা যায় যে, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ইমাম, ফকীহ, সাধকগণ শাসকদের চোখ রাঙানিকে ভয় না করে তারা তাদের সত্যভাষণ প্রচার করেছেন নানাভাবে। প্রয়োজনে তারা শাসক বা খলীফার নামে স্বতন্ত্র লিখনী ও পত্রের মাধ্যমে সৎ উপদেশ দিয়ে তাদের দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে থাকতেন।

আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের নামে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র কাযী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রে খলীফার প্রতি তিনি যেসব উপদেশ দান করেন, সত্যবাদিতা ও সাহসিকতার ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পত্রখানার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হল- হামদ-নাত পর, আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীনকে দীর্ঘায়ুদান ও তাঁকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। এই ক্ষণস্থায়ী জগতে আমীরুল মুমিনীন যেসব সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ভোগ করছেন, তা যেন শুধু এখানেই সীমিত না থাকে বরং পরকালেও তা উপভোগ করতে পারেন এবং তিনি যেন আল্লাহ-তাআলার সবচেয়ে বড় নিআমত হযরত রাসূলে কারীম e এর শাফাআত ও তাঁর সাহায্য লাভ করতে পারেন। আপনার একথা ভুললে চলবে না যে, আল্লাহ পাক আপনাকে তাঁর সৃষ্টির হিফাযতকারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, আপনি তাদের জন্য রাখালস্বরূপ এবং তারা আপনার প্রজা। এই অবস্থায় আপনি যেন অহংকারী না হন। আপনি শাসনকর্তা হয়ে মহাপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি যদি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে যান, আল্লাহ আপনাকে অশেষ সাওয়াব দান করবেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ তাআলার আযাব-শাস্তি অতি কঠোর। আপনি খিলাফতের আসনে সমাসীন। স্মরণ রাখবেন, ভিত্তি ছাড়া কোন ইমারত কায়িম থাকতে পারে না। সরকারের জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকার ভিত্তি যদি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এর কোন চিহ্ন থাকে না। আমি আপনাকে উপদেশ দান করছি যে, অবশ্যই আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখবেন এবং এতে অবহেলা করে নিজের ও নিজের প্রজাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা করবেন না । যে কাজে আল্লাহর ভয় থাকে, তা-ই ঠিক।

আল্লাহকে ভয় করার প্রয়োজন হচ্ছে, নিজের কর্তব্যগুলো উপযুক্ত সময়ে সম্পাদন করা এবং তার জন্য পরিশ্রম করা। আর কোন কাজই আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবেন না। এতে কাজের গুরুত্ব কমে যায় এবং কে বলতে পারে যে, উক্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে কি না। আপনি প্রজাদের খিদমাত এবং তাদের সুখ-শান্তির জন্য যে মুহূর্তটি ব্যয় করবেন, তা নফল ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম। যে শাসনকর্তা দ্বারা তার প্রজারা শান্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিবস সেই বেশি সুখী হবে।

স্মরণ রাখবেন, প্রজারা তাদের শাসনকর্তার কাজকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আপনি যদি সঠিক পথে না থাকেন, তাহলে প্রজারাও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়বে। তাই আপনি শরীআতবিরোধী সকল প্রকার আশা-আকাংখা ও প্রবৃত্তিগুলোকে আয়ত্বাধীন রাখবেন। এবং রাগ ও ক্রোধকে দমন করবেন। এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকাল চিরস্থায়ী ও একটি বাস্তব সত্য।

যেসব কথা দিয়ে দুনিয়ার পরিবর্তে পরকালের উপকার হবে তাই বলবেন, স্বজনপ্রীতি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবেন। একজন ন্যায়বিচারক শাসনকর্তার দৃষ্টিতে আপন-পর সবাই সমান। তিনি একথা চিন্তা করেন না যে, কে কার আত্মীয়, কে বন্ধু বা পর। বরং তিনি শুধু এটাই দেখেন যে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সত্য কথা বলতে কখনও ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। যে কাজের আদেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়েছেন তার যতই বিরোধিতা করা হোক না কেন, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তা সমাধা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখে আল্লাহও তার হিফাযতের দায়িত্ব বহন করেন। রোজ কিয়ামতের জন্য এখন থেকে আমলের পুঁজি প্রস্তুত রাখবেন। মৃত্যু এমন পথ, যার উপর দিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই একদিন অতিক্রম করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে চাই সে ধনী হোক আর দরিদ্র হোক একদিন এই পথে চলতে হবে। মৃত্যুর পর এমন এক ভয়ানক স্থান পাওয়া যাবে সেখানে বড় বড় বীর পাহলোয়ানরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। কুখ্যাত অত্যাচারীরাও সেদিন বোবা বনে থাকবে। মানুষের অন্তরে ঐ স্থানের ভয় এত ভয়ানক আকার ধারণ করবে যে, অনুতাপ অনুশোচনায় তাদের ঘাড় নিচু হয়ে যাবে। সেখানের উপস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হবে। এবং রোজ কিয়ামত খুব ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

পবিত্র কুরআনে কিয়ামতের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি চিন্তা করবেন। আল্লাহ পাক সেদিন ন্যায়বিচার করবেন, পাপীর কোনো অনুতাপ সেদিন কাজে আসবে না। দিন-রাত্রির পরিবর্তন কিয়ামতের দিনকে অতি নিকটবর্তী করছে। দিন শেষে রাতের আগমন হয়, আবার দিন যায় রাত আসে। প্রত্যেক নতুন জিনিস পুরাতন রূপ ধারণ করে। আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন এবং সেইদিনের কথা স্মরণ করুন।

আপনি যখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন তখন আপনাকে স্বীয় আমলের জবাব দান করতে হবে। এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিদান শান্তিপূর্ণ ইনসাফের সাথে প্রদান করবেন।

আমীরুল মুমিনীন! আমি দুআ করি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আপনাকে যেন এমন অবস্থায় পেশ করা না হয় যে, আপনার পোষাক অন্যায়, অবিচার ও যুলমের দাগে কলংকিত হবে

। স্মরণ রাখবেন, সেইদিন কোনো পারিবারিক মর্যাদা কিংবা জাগতিক শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কোনো কাজে আসবে না। সেইদিন কোনো লোকের গঠনপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে না, দৃষ্টি রাখা হবে তার আমলের প্রতি। আল্লাহ আপনাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তিনি আপনাকে শাসন ক্ষমতাও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে দান করেছেন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেই উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা আপনি কতটুকু পূরণ করেছেন এবং যেই উদ্দেশ্যে আপনাকে খিলাফতের আসন দান করা হয়েছিল, আপনি এর কতটুকু যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক

আল্লাহর পথ ও আইন এতই প্রশস্ত, এতই ব্যাপক এবং এতই পূর্ণাঙ্গ যে, সেগুলো অনুযায়ী আমল করা হলে জগৎ হতে যুলম-অন্যায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং জগৎ সত্য ও ন্যায়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে।

আপনাকে প্রশ্ন করবেন, উত্তরের জন্য এখন হতে প্রস্তুত থাকুন। শাসনভার আপনার স্কন্ধে অর্পিত হওয়ার কারণে আপনার দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কেউ এই চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না-

১। তার আমলের কী কী অবস্থা?

২। যৌবন কোথায় এবং কী কাজে শেষ করেছে?

৩। ধন কী কী উপায়ে অর্জন করেছে এবং তা কী কাজে ব্যয় করেছে?

৪। শরীর ও মনকে কী কাজে ন্যস্ত রেখেছে?

আমীরুল মুমিনীন! এ সকল প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল, এগুলির উত্তর চিন্তা করে রাখবেন। আজ আপনি যা করছেন, কাল তা অবিকল আপনার সামনে উপস্থিত করা হবে, যা অবলোকন করে আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সকল দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সেগুলি সততা ও পরিশ্রমের সাথে পালন করুন এবং আপনাকে যে জিনিসের গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তার খিয়ানত করবেন না। আপনি যদি আমানতের হিফাযত না করেন, তাহলে আপনার কদম পুলসিরাতে স্থির থাকবে না, আপনার চোখে আবরণ পড়ে যাবে, আপনার অন্তর হতে সত্য ও অসত্যের পার্থক্য দূর করে ফেলা হবে, আপনি আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। আপনার অন্তর যখন খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হয় তখন কঠোরভাবে এর মুকাবিলা করবেন।

আল্লাহর ক্রোধকে ভয় করুন এবং তার শরনাপন্ন হোন যে, আপনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বীয় কর্তব্যাবলী পালনে যেন ত্রুটি না করেন এবং যেসব লোকের দাবি দাওয়া ও স্বার্থ এবং জানমালের হিফাযত আপনারই দায়িত্ব, তা পালন করতে অবহেলা করবেন না। সরকারি কাজে ত্রুটির শাস্তি এতই কঠোর যে কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে। আপনি যদি প্রজাদেরকে ভুলে যান তারাও আপনাকে ভুলে যাবে।

আমীরুল মুমিনীন! প্রজাদের সেবা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ও অধিকারসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখার পর আপনার একটি উত্তমকাজ হচ্ছে এই যে 'জবানকে' আল্লাহর যিকরে লিপ্ত রাখবেন এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পৌঁছাবেন। তিনিই সেই সত্য নবী যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁরই বদৌলতে আপনাকে খলীফা বলা হয়। হযরত রাসূলে কারীমের ﷺ পবিত্র জীবন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আল্লাহর পথ ও আইন এতই প্রশস্ত, এতই ব্যাপক এবং এতই পূর্ণাঙ্গ যে, সেগুলো অনুযায়ী আমল করা হলে জগৎ হতে যুলম-অন্যায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং জগৎ সত্য ও ন্যায়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে।

আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে উপদেশ প্রদান করছি যে, রাষ্ট্রে শরীআতী আইন-কানুনের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করবেন, আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ' (সীমা) কায়িম করবেন এবং বাঁচার অধিকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। জমি মালিকদের হক আদায় করবেন এবং হযরত ও তাঁহার সাহাবীগণের মাধ্যমে যেসকল নিয়মনীতি আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলিকে চালু রাখবেন।

আমীরুল মুমিনীন! স্মরণ রাখবেন, হযরতের সকল 'সুন্নাত' ও 'আদর্শকে' জীবিত রাখা সর্বোত্তম কাজ।

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

রানি বিলকিসের সিংহাসন



বহুকাল আগে দূরে এক দেশে হুদহুদ নামক একটি পাখি সাবা ভূমির উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে সে যা দেখেছিল তা দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অনেক্ষণ দেখার পর সে ডানা মেলে হযরত সুলাইমান (আ.) এর রাজ্যে ফিরে এলো এবং ঘোষণা করলো–: "আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা হতে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি তো এক নারীকে দেখলাম সেখানে রাজত্ব করছে। তাকে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে এবং তার একটি মহাসিংহাসন রয়েছে। আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না। সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে এজন্য যে, তারা যেন আল্লাহকে সিজদাহ না করে। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মহা আরশের অধিপতি! (সূরা নামল, ২২-২৬)

হুদহুদ পাখি যা দেখে এসেছে তা বর্ণনা করে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। তখন এখনকার মতো এই ধরনের শাসকের পদে একজন মহিলা থাকা আদর্শ ছিল না। এবং স্পষ্টতই, এই মহিলা তার ক্ষমতা ছাড়াও আল্লাহর অনেক নিআমত উপভোগ করছিলেন। তবুও হুদহুদের জন্য সবচেয়ে মর্মান্তিক যেটি ছিল তা হলো, সিংহাসন এবং তার জমিনের মহিমা থাকা সত্ত্বেও এই অসাধারণ রানি আল্লাহর উপাসনা করছেন না বরং সূর্যের উপাসনা করছিলেন। এমনকি রানি একাকী সূর্য পূজায় লিপ্ত ছিলেন না। হুদহুদ উল্লেখ করেছে যে "তিনি এবং তার লোকেরা" একসাথে এই উপাসনা বা পূজায় লিপ্ত ছিলেন। যা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ককে চিত্রিত করে। অনিবার্যভাবে, পৃথিবীর যেখানেই কেউ যান না কেন, শাসকের বিশ্বাস একটি জাতির বিশ্বাসকেও প্রভাবিত করবে; যারা কর্তৃত্বে আছেন তাদের বিশ্বাস সর্বদা তাদের শাসন করা লোকদের প্রভাবিত করবে।

হুদহুদ এই অবস্থা দেখে মুগ্ধ ও উদ্বিগ্ন ছিল। কীভাবে কেউ আল্লাহর অস্তিত্বকে চিনতে পারে না এবং তাঁর প্রাপ্য অর্থাৎ তাঁর উপাসনা করে না, যেখানে তারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর নিআমত ভোগ করছিল? আল্লাহর একজন নবী হিসেবে সুলাইমান (আ.) জানতেন যে, এই রানিকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া তার কর্তব্য।

সুলাইমান হুদহুদকে নির্দেশ দিলেন– আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছো নাকি মিথ্যা। যাও আমার এই চিঠি নিয়ে তুমি তাদের কাছে পৌঁছে দাও। তারপর দূর থেকে লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়। (সূরা নামল, ২৭-২৮)

সুলাইমান (আ.) ভাবতে লাগলেন, রানি আসলে কী ধরনের শাসক এবং আমার চিঠি পাওয়ার পর তিনি কী প্রতিক্রিয়া দেবেন। আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে বিলকিস (সাবার রানি) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রানি বিলকিস পত্র হাতে নিয়ে বললেন, "হে পরিষদবর্গ, আমার কাছে একটি মহৎ চিঠি এসে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সুলাইমানের কাছ থেকে এসেছে। এটি "আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু। অহমিকাবশে আমার সাথে অহংকার করো না বরং আমার আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।" (সূরা নামল, ২৯-৩১)

অবিলম্বে দেখা যায় প্রজ্ঞাবান একজন মহিলা, একজন শাসক যিনি নিজেকে তার লোকদের থেকে দূরে রাখেন না; তিনি তার চারপাশের লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি এমন একজন মহিলা, যার বুদ্ধি ও ভদ্রতা তার প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট। তিনি তার ক্যাবিনেটের কাছে চিঠির লেখা পড়ে শোনানোর সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি ইতোমধ্যে চিঠিটি কয়েকবার পড়েছেন। চিঠি সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন; তিনি যা পড়েছেন তাতে তিনি ভয় পাননি বরং মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ, তিনি এটিকে 'কিতাবুন কারীম' হিসেবে বর্ণনা করেছেন- যা একটি মহৎ এবং করুণাময় বার্তা।

সুলাইমান (আ.) এর চিঠিটি 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু হয়, অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণ করে, এবং তিনি স্বীকার করেন যে, এটি তার নিজের সম্পর্কে নয় এবং তিনি নিজে কতটা মহান তা নয়। বরং তিনি যা বলেন এবং যা করেন তা তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে নয়, বরং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

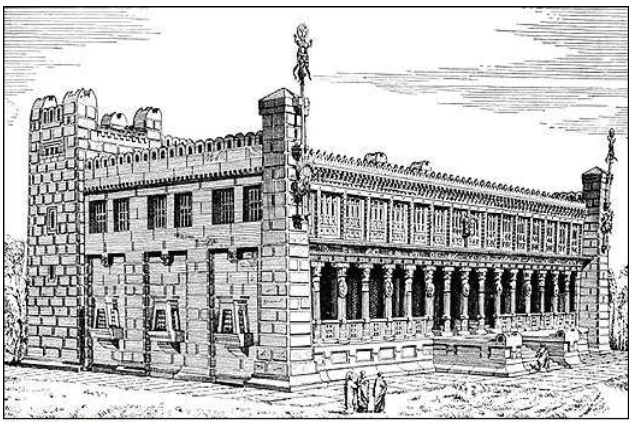
বিলকিস সুলাইমান (আ.) এর কথার সূক্ষ্মতাও চিন্তা করেছেন: যখন তিনি দেখলেন চিঠিতে লেখা ছিল 'আল্লা তা'লু আলাইয়্যা' অর্থাৎ তিনি তাকে তার প্রতি অহংকার না করার জন্য বলছিলেন। এবং তার বিরুদ্ধে সামরিকভাবে অগ্রসর না হওয়ার জন্য তাকে সতর্ক করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হুদহুদ সাবার প্রভাব এবং শক্তি লক্ষ্য করে। হতে পারে যে সাবার রানি তার সীমানা সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করছে।

সুলাইমান (আ.) বলতে থাকলেন, "ওয়া উতুনি মুসলিমীন" আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে এসো।" তিনি বললেন, হে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আমাকে পরামর্শ, অভিমত বা উপদেশ দিন। আপনাদের উপস্থিতি বা পরামর্শ ব্যতিত আমি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব না। (সূরা নামল ২৭-৩২)

নিঃসন্দেহে একজন শাসক হিসেবে সাবার সফল রানির এই সত্য বার্তার সাথে কিছু করার ছিল । যে কারণে তিনি বেপরোয়া, তাড়াহুড়ো বা আবেগপ্রবণ ছিলেন না। 'আফতুনী' অর্থাৎ 'আমাকে উপদেশ দাও' শব্দটি 'ফতওয়া' এর সাথে সম্পর্কিত- যেমনটি এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ বোঝায় কাউকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া, একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ সরবরাহ করা। বিলকিস কেবল তার মন্ত্রীদের জানাননি যে তিনি সুলাইমানের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন, তিনি চিঠিটি সম্পূর্ণরূপে পড়ার পর তার নিজস্ব উপলব্ধিসহ তাদের কাছে চিঠির সম্পূর্ণ তথ্য বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, তাই আপনি কী আদেশ করবেন ভেবে দেখুন। (সূরা নামল, আয়াত-৩৩)

বিলকিসের মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা তার মতোই দূরদর্শী ছিল। যদিও তারা প্রভাবশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল, যারা সামরিক শক্তি চালাতো। তবুও তারা তার ক্ষমতাকে স্বীকার করেছিল এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাকে বিশ্বাস করেছিল।

তিনি বলেছিলেন, রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা সেটিকে ধ্বংস করে এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদের অপদস্ত করে। এবং তারাও এটা করবে। আমি তাদের কাছে উপহার পাঠাব এবং দেখব কী (উত্তর নিয়ে) দূতরা ফিরে আসে। (সূরা নামল ৩৪-৩৫)



রাজাদের আচরণ সম্পর্কে রানির এই মন্তব্য তার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তাকে প্রদর্শন করে। যে কারো চেয়ে তিনি ভালো জানতেন যে, বিজয়ীরা মিডিয়া প্রচারণায় নিয়োজিত। তারা রাজনৈতিক নিপীড়ন চালায় এবং যে কোনো বিরোধীকে নির্মমভাবে চূর্ণ করে। তার সিদ্ধান্তটি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির একটি ছিল। তিনি সুলাইমান (আ.)-কে পরীক্ষা করার জন্য উপহার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রানি বিলকিস আসলে দেখতে চেয়েছিলেন সুলাইমান (আ.) কর্তৃক ইসলামে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি আসলেই নীতিগত ছিল নাকি এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ঘুষ চাওয়ার একটি অজুহাত ছিল।

বিশিষ্ট মুফাসসির ও তাবিঈ কাতাদাহ (র.) তার চিন্তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন: আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন- তিনি একজন মুসলিম হিসেবে এবং (এর আগে) একজন মূর্তিপূজারী হওয়া সত্ত্বেও কতটা জ্ঞানী ছিলেন! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন উপহার দেওয়া মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে। ইবন আব্বাস এবং অন্যরা বলেছেন: "তিনি তার লোকদের বলেছিলেন, যদি তিনি উপহার গ্রহণ করেন তবে তিনি একজন রাজা, সুতরাং তাঁর সাথে যুদ্ধ করব; কিন্তু যদি তিনি উপহার গ্রহণ না করেন, তবে তিনি একজন নবী, তাই তাকে অনুসরণ করব।

এখন হযরত সুলাইমান (আ.) এর প্রতিক্রিয়ায় আসি, অতঃপর যখন তারা সুলাইমানের কাছে এলো তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে এসেছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দ বোধ করছো! তোমরা ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আসবো, যা মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে অপমাণিত অবস্থায় বের করে দেব এবং তারা অপদস্থ হবে। (সূরা নামল ৩৬-৩৭)

সুলাইমান (আ.) এর উত্তর সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে। স্বীকার করে যে, সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে এবং তিনিই তা দান করেন। তার প্রতিক্রিয়াও ছিল রাজনৈতিক জ্ঞানের মধ্যে একটি: তিনি মূলত বলছেন যে, তারা মনে করেছে তারা তাকে কিনে নিতে পারে। এমনকী তারা এতোটাই আত্মবিশ্বাসী যে, তারা মনে করেছে তাকে পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সহজ হবে। সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে তাদের এই হাস্যকর ধারণা সুলাইমান (আ.) এর শানের সাথে যায় না। সেজন্যই তাঁর হুমকি ছিল কঠোর। বার্তা বিনিময় হলো শাসকদের একে অপরের মেধা পরীক্ষা করা, অন্যের শক্তি এবং সম্মান ও নীতির প্রতি অঙ্গীকার পরীক্ষা করা। যাই হোক, অবশেষে দুই রাজার মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

তিনি (সুলাইমান (আ.) বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে তোমাদের মধ্যে কে আছো তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? জিনদের মধ্য থেকে একজন শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি এটি আপনার কাছে নিয়ে আসব এবং প্রকৃতপক্ষে, আমি এই [কাজের] জন্য শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত। ধর্মগ্রন্থের

একজন জ্ঞানী বললেন, আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসব। অতঃপর যখন (সুলাইমান আ.) তা তার সামনে রাখা দেখলেন তখন বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে; আর যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও উদার।

সুলাইমান (আ.) বললেন, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, আমি দেখব সে [সত্যের পথে] হিদায়াত পায় নাকি যারা হিদায়াত পায়নি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর যখন সে (বিলকিস) উপস্থিত হল, তখন তাকে বলা হল, তোমার সিংহাসন কি এমনই? তিনি বললেন, এটা তো সেটাই। আমাদেরকে ইতোমধ্যে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পন করেছি। (সূরা নামল ৩৮-৪২)

সুলাইমান (আ.) এর সামনে বিলকিসের এটি চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল, যা তার বুদ্ধির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। বিশিষ্ট মুফাসসির ও তাবিঈ মুজাহিদ বলেছেন: তিনি (সুলাইমান (আ.) আদেশ জারি করেছিলেন যে, এটি পরিবর্তন করো। তাই যা লাল ছিল তা হলুদ এবং যা সবুজ ছিল তা লাল করা হলো। এমনকি সবকিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। ইকরামা বললেন, তারা কিছু জিনিস যোগ করেছে এবং কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এটি নিচে এবং সামনের দিকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু জিনিস যোগ করা হয়েছিল এবং কিছু জিনিস সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিলকিস একজন সতর্ক এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মহিলা ছিলেন। দ্রুত রায় দিতে বা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেননি বা অস্বীকার করেননি আগে তার যে সিংহাসনটি ছিল সেই সিংহাসনে তিনি সাবাতে রাজত্ব করেছিলেন; তিনি শান্ত এবং নিরবচ্ছিন্নচিত্তে কেবল তার নিজের সম্বন্ধে এবং সেই মুহূর্তে তার সামনে যে সিংহাসনটি ছিল সেই সিংহাসনের সাথে তার আগের সিংহাসনের সাদৃশ্য স্বীকার করেছিলেন।

তাকে বলা হল, প্রাসাদে প্রবেশ কর। কিন্তু যখন সে প্রাসাদ দেখল, তখন সে সেটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করে তার পাদুকা খুলে ফেলল। সুলাইমান বললেন, প্রকৃতপক্ষে, এটি তো একটি স্বচ্ছ-স্ফটিক প্রাসাদ [যার মেঝে] কাঁচ দিয়ে মসৃণ করা হয়েছে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি যুলম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি। (সূরা নামল ৪৪)

সাবার রানির আচার-আচরণ কত সুন্দর! তার বুদ্ধিমত্তা, তার মর্যাদা এবং তার করুণা সবই মাত্র কয়েকটি শব্দে তুলে ধরা হয়েছে। তার পূর্বের অন্যায় স্বীকার করতে কোনো অহংকার নেই- কোনো জেদ নেই। আছে শুধু সততা। তিনি এই দিনে আশ্চর্যজনক জিনিসগুলির সাক্ষী হয়েছিলেন এবং সত্যের মধ্যে তিনি তার অহংকারকে হস্তক্ষেপ করতে দেননি। এই দিনে তিনি সুলাইমান এর সঙ্গে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

কুরআনে আল্লাহ যেভাবে গল্পটি বলেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এটি তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও অনুগ্রহের ঘোষণার সাথে শেষ হয়। অনেকেই বিলকিসের গল্পটিকে একটি রোমান্টিক গল্পে পরিণত করেন বা যুক্তি দেন যে, তিনি সুলাইমান (আ.) এর কাছে তার রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা দেখলাম তার সম্পর্কে যেসব (আয়াতে বলা হয়েছে) তাতে এর কোনোটিই ইঙ্গিত করা হয়নি।

আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে একজন নারী সম্পর্কে অবগত করান, যার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা উভয়ই ছিল; যিনি নিজেকে ভয়ে দোলাতে দেননি কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে সেই মনোভাব প্রদর্শন করেন যা আমাদের সকলের থাকা উচিত। জ্ঞান খোঁজার ইচ্ছে থাকা, অভিজ্ঞতা লাভ করা, সতর্ক হওয়া, কিন্তু একগুঁয়ে হওয়া নয়। উন্মুক্ত মনের হওয়া, কিন্তু সহজেই ঝলসে যাওয়া নয়। সর্বোপরি, আমরা যে ভুল করেছি তা স্বীকার করার ক্ষমতা এবং বিশ্বাস ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মর্যাদার সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

কীভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় সাবার রানি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ আমাদেরকে নিচে নিয়ে যায় না বরং আমাদেরকে উচ্চতর করে তোলে। সুলাইমান (আ.) এবং বিলকিসের মধ্যকার সম্পর্ক বিলকিসের চূড়ান্ত ঘোষণা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে; তাদের উভয়কেই একই সাথে কর্তৃত্ব এবং নম্রতার অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রতিটি দল একে অপরকে সম্মান করবে। একে অপরের শক্তিকে স্বীকার করবে এবং মানুষ হিসেবে উন্নতি করতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। সর্বোপরি, আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করার জন্য একে অপরকে সমর্থন করবে। কুরআনে আমরা যে চিত্রটি দেখেছি তা হলো, সুলাইমান (আ.) এবং বিলকিস (রাজা এবং রানি) নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর দাস হিসেবে সমভাবে সমর্পণ করেছেন। আর কত সুন্দর হতে পারে তাদের সম্পর্ক?

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সাবার রানিকে আমাদের কাছে একজন আশ্চর্যজনক ব্যক্তির উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে তিনি সেই বিপথগামীদের মধ্যে ছিলেন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করেছিল কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা এবং সততা তাকে সত্য চিনতে এবং সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে সাহায্য করেছিল। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা একজন সত্যিকারের আদর্শ নারীকে দেখতে পাই। যিনি তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা বা তার দুর্দান্ত বিলাসিতাকে আধ্যাত্মিকভাবে নত হতে বাধা দেননি।

পূর্ণ উপলব্ধি লাভের জন্য বিলকিস এবং সুলাইমান (আ.) এর মতো (পুরুষ ও নারীকে) পার্থিব সাফল্য এবং আধ্যাত্মিক বশ্যতা উভয়ের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তুল ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র যখন আমরা স্বীকার করব যে, একে অপরকে সমর্থন করার মধ্যে আমাদের শক্তি নিহিত রয়েছে, তখনই আমরা একইভাবে সন্তুষ্টি এবং সাফল্য পাবো। একজন নবী এবং একজন রানিকে অনুসরন করে শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবো।

(ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই প্রবন্ধটি পরওয়ানা পাঠকের জন্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে ভাষান্তর করেছেন জামান আহমদ।-বিভাগীয় সম্পাদক)



মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

দুর্ভাগ্যই খুলে দেয় সৌভাগ্যের কপাট

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

দূর বিয়াবান হতে দীর্ঘ সফর শেষে বেদুঈন দারুল খিলাফতে উপনীত হলো। তাকে স্বাগত জানাতে খলীফার ভৃত্য ও রাজকর্মচারীরা এগিয়ে এলো। তারা বেদুইনকে রাজকীয় মেহমানের মতো প্রাণ উজাড় করা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ধরাধরি করে তার মাল সামানা নামিয়ে রাখল। দরবারের নিয়ম মাফিক দূরের মুসাফিরের চোখে মুখে আচকানে গোলাপজল ছিঁটাল। ফুলচন্দনে তাকে বরণ করে নিলো। বেদুইন তো এমন সমাদরে আবেগে আপ্লুত, শান্তি ও মমতার পরশে সিক্ত।

বেদুইন খলীফার দরবারে কিছু বলার আগেই রাজকর্মচারীরা তার প্রয়োজন ও অভাবের কথা বুঝে ফেলল। কারণ, দরবারের নিয়মই ছিল, অভাবীরা দরবারে আসলেই কোনোকিছু চেয়ে বা যাচনা করে সংকোচিত ও লজ্জিত হওয়ার আগেই তাকে অকাতরে দান-দক্ষিণায় ভরে দেওয়া হয়। রাজ কর্মচারীরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলল,

پس بدو گفتند یا وجه العرب

از کجایی چونی از راه و تعب

পাস বেদু গোফতান্দ ইয়া' ওয়াজহুল আরাব

আয কুজা'য়ী চোনী আয রা'হ ও তাআব

তাকে তারা বলল: ওহে আরবের সম্মানের পাত্র সুজন!

কোত্থেকে আপনি কীভাবে এলেন, আছেন কেমন?

খিলাফতের দরবারে এসে এতো সম্মান এমন অভ্যর্থনায় বেদুইন জড়োসড়ো। সামান্য বেদুইনকে আরবের সম্মানের পাত্র বলাতে সে কৃজ্ঞতায় অবনত। বলল, খলীফার মহান দরবার হতে যদি সম্মান পাই তবেই আমি নিজেকে সম্মানের পাত্র ভাবতে পারি। আর যদি আমার প্রতি দয়াদৃষ্টি দেওয়া না হয়, তাহলে আমার তো কোনো মূল্য নাই।

রাজ দরবারের কর্মচারীদের মধুর ব্যবহার ও আতিথ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলানার স্মৃতিতে ভেসে উঠে তার পীর মুর্শিদের কথা। ভাবনায় তিনি এখন তার প্রিয়জনের সম্মুখে। তার সাক্ষাত লাভের মহিমার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলানা আত্মহারা।

ای کہ یک دیدارتان دیدارها

ای نثار دیدتان دینارها

আই কে য়্যক দীদা'রতা'ন দীদা'র হা

আই নেসা'রে দীদেতা'ন দীনা'রহা

ওহে যার একবার সাক্ষাতে শত সাক্ষাতের সার্থকতা

ওহে যাকে দেখতে বিলাতে হবে স্বর্ণমুদ্রা নযরানা।

মাওলানা রূমীর কাঙ্খিত সেই প্রিয়জন এই দুনিয়ায় আল্লাহর বন্ধুজন। তার একবার সাক্ষাত লাভের মধ্যে শতবার সাক্ষাতের সার্থকতা লুক্কায়িত। আর তাকে একবার দেখার গুরুত্ব এতখানি যে, তার জন্য বিস্তর স্বর্ণমুদ্রা বিলানো যায়। মাওলানা এখানে আল্লাহর ওলীর রূহানী শক্তির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

ای همه بنظر بنور الله شده

از بر حق بهر بخشش آمده

আই হামে ইয়ানযুর বেনূরিল্লাহ শুদে

আয বারে হক বাহরে বখশিশ আ'মাদে

ওহে যে সবার প্রতি তাকাও আল্লাহর নূরের দৃষ্টিতে
আল্লাহর তরফে এসেছ অনুগ্রহরাশি বিলাতে।

তার দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যে, তিনি যেন আল্লাহর নূর দিয়ে দেখেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

"তোমরা মুমিনের বিচক্ষণতা সম্পর্কে সতর্ক থাক। কেননা, সে আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে।"

তার দৃষ্টি যদি কোথাও পতিত হয়, কথায় বলে সেখানে মাটি স্বর্ণ হয়ে যায়।

تا زنید آن کیمیاهای نظر
بر سر مسهای اشخاص بشر
তা' যানীদ আ'ন কীমিয়া'হা'য়ে নাযার
বার সরে মিসহা'য়ে আশখা'সে বাশার
সেই দৃষ্টির পরশমণির যাতে দাও নযর
মানব সন্তানের তামাতুল্য সত্তার উপর।

ওহে আল্লাহর ওলী! আমার বিনীত আরয। তোমার সেই পরশমণিতুল্য দৃষ্টি দিয়ে মানব সন্তানের তামাতুল্য সত্তার উপর নযর কর। আর সেই তামাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দাও। বেদুইনের ভাষা ও চেতনা এখন মাওলানার সাথে একাকার। সেই সুবাদে বেদুইনের চেতনা যেন এখন বাগদাদে খিলাফতের দরবারে নয়; আরশের মালিকের সমীপে সমর্পিত।

من غریبم از بیابان آمدم
بر امید لطف سلطان آمدم
মান গরীবাম আয বিয়া'বা'ন আ'মাদাম
বার উমীদে লুতফে সুলতা'ন আমাদাম
আমি ভিনদেশী এসেছি মরুবিয়াবান পাড়ি দিয়ে
এসেছি মহামহিম বাদশাহর দয়াদৃষ্টির আশে।

بوی لطف او بیاباها گرفت
ذره‌های ریگ هم جاها گرفت
বূয়ে লুতফে উ বিয়া'বা'নহা' গেরেফত
যাররেহা'য়ে রীগ হাম জা'নহা' গেরেফত
তার দয়া-দাক্ষিণ্যের সুবাসে মুগ্ধ মরুবিয়াবান
বালুরাশির অনুপরমাণুতেও এসেছে প্রাণের বান।

মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত আসার পেছনে আমার আশা ছিল স্বর্ণ মুদ্রা লাভ, জীবনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা। কিন্তু দরবারে পৌঁছার পর আমার উদ্দেশ্য বদলে গেছে। আমি খলীফার সাক্ষাত লাভের জন্য এখন পাগলপারা।

মাওলানা রূমী এখানে বলতে চান যে, কোনো কোনো সময় মানুষ সাধারণ উদ্দেশ্য বা দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা লাভের নিয়তে কোনো কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজটি করার সময় এমন উপলব্ধিতে উপনীত হয়, যা তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বদলে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ শিশুরা শুরুর দিকে লেখাপড়ায় মন দেয় না। তাদের মনে হয়, মাদরাসায় বা স্কুলে লেখাপড়ার চেয়ে কষ্টের কাজ বুঝি দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই। এ কারণে মা বাবারা শিশুদেরকে পড়াশুনা করলে মিষ্টান্ন বা উপহার সামগ্রী কিনে দেওয়ার ওয়াদা দেয়। শিশু তখন মিষ্টান্ন পাওয়ার আশায় লেখাপড়া শুরু করে। কিন্তু আস্তে আস্তে লেখাপড়ায় এমনভাবে মন বসে যে, জ্ঞান আহরণের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কাছে ঘুম, খাওয়া দাওয়া, খেলা বা বিনোদন হার মানে। জ্ঞান গবেষণার প্রতি তাদের আকর্ষণ এমন প্রচণ্ড রূপ নেয়, যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ রৌপ্য তার পায়ে উৎসর্গ করা হয় তার বিনিময়েও সে লেখাপড়া জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত হয় না। মাওলানা ইতিহাস থেকে প্রমাণ উপস্থিত করে বলেন:

همچو اعرابی که آب از چه کشید
آب حیوان از رخ یوسف چشید
হামচো 'আরাবী কে আ'ব আয চাহ কাশীদ
আ'বে হায়ওয়া'ন আয রূখে ইউসুফ চাশীদ
সেই বেদুইনের মতো যে পানি তুলল গভীর কূপ থেকে
কিন্তু অমৃত সুধা পান করল ইউসুফের রূপের মাধুরি দেখে।

মাওলানা ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী সামনে আনেন। ইউসুফ (আ) কে তার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে কূয়ায় নিক্ষেপ করেছিল। সে পথ দিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি বাণিজ্য কাফেলা। কাফেলা যাত্রা বিরতি করলে তাদের একজন পানি আনার জন্য কূয়ার কাছে যায়। পানির আশায় যখন কূয়ায় বালতি ফেলে তখন পানির পরিবর্তে বেরিয়ে আসেন অপরূপ সুন্দর বালক ইউসুফ। এই ঘটনায় বণিক গিয়েছিল পানির আশায়। কিন্তু পেয়ে গেল ইয়াকুব তনয় ইউসুফ (আ.) কে। কুরআন মাজীদে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

"এক মুসাফির দল আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর। অতপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।"[১]

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা:

رفت موسی کآتش آرد او بدست
آتشی دید او که از آتش برست
রাফত মূসা' কা'তাশ আ'রাদ উ বে দাস্ত
আ'তশী দীদ উ কে আয আ'তাশ বেরাস্ত
মূসা গেলেন আগুন দেখে আগুন সংগ্রহ করতে
দেখল আরেক আগুন, আগুনের কথা গেল ভুলে।

শ্বশুর শোয়াইব (আ.)-এর বাড়ি মাদায়েন থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মিশর যাচ্ছিলেন মূসা (আ.)। পথে রাত নামে। শীতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। মূসা বললেন, অদূরে পর্বতে আগুন দেখছি। সেখান থেকে তোমাদের জন্য আগুন আনতে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন আগুন নয়; একটি গাছে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী আলো-ঝলমল করছে। তখন তিনি আগুনের কথা ভুলে গেলেন। কুরআন মাজীদে ঘটনার চিত্রায়ণ এভাবে:

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى– فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ– إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى– وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ

"সে যখন আগুন দেখল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমারা এখানে থাক, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব। অথবা আমি আগুনের

কাছে কোনো পথ নির্দেশ পাব। অতপর যখন সে আগুনের নিকট আসল তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।"[২]

অর্থাৎ মূসা গিয়েছিলেন এক উদ্দেশ্যে। পেয়ে গেলেন তার চেয়ে বড় ও ভিন্ন কিছু। হয়রত ঈসা (আ.)-এর জীবন থেকেও মাওলানা রূমী (র.) উদাহরণ দিচ্ছেন।

جست عیسی تا رهد از دشمنان
بردش آن جستن به چارم آسمان

জাস্ত ঈসা' তা' রাহাদ আয দুশমনা'ন
বুরদাশ আ'ন জুসতান বে চারুম আ'সেমা'ন
ঈসা পালালেন যেন রক্ষা পান দুশমনের হাত হতে
সেই পলায়ন নিয়ে গেল তাকে উর্ধ্বে চতুর্থ আসমানে।

ইয়াহুদী বাদশাহ ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করেছিলেন। বাদশাহর লোকজনের ধাওয়া খেয়ে ঈসা (আ.) একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে চতুর্থ আসমানে তুলে দুশমনের হাত থেকে নাজাত দেন।

আরো একটি উদাহরণ। আর তা আদি পিতা (আ.)-এর জীবন থেকে।

دام آدم خوشۂ گندم شده
تا وجودش خوشۂ مردم شده

দা'মে আ'দাম খোশেয়ে গান্দুম শুদে
তা' ওয়াজুদাশ খোশেয়ে মারদুম শুদে
গমের শীষ আদমের জন্য ফাঁদ হয়েছিল বটে
সেই আদমের অস্তিত্বই মানুষের শীষ হল শেষে।

বেহেশতে আল্লাহ তাআলা বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.) কে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। সেই গাছ ছিল গন্দুমের। ফারসী বা উর্দুতে গন্দুম মানে বাংলায় গম। আমরা যদি অনুমান করি যে, তখনকার গম আস্ত বড় ফলের মতো ছিল, তা হাইব্রিডের অভিজ্ঞতার আলোকে অবাস্তব ভাবার কারণ নেই। হতে পারে গম তখন ইয়া বড় ছিল। মানুষের কায়াও ছিল আজকের তুলনায় ষাট গজ। আস্তে আস্তে কালের বিবর্তনে আকার ছোট হয়ে গেছে। বর্তমানে যে ফলের নতুন জাত আবিস্কার আর আকার পরিবর্তনের প্রযুক্তি মানুষের হাতের নাগালে এসেছে, তার উপর অনুমান করে উক্তরূপ কল্পনা করার অবকাশ অবশ্যই আছে। যাই হোক সেই গন্দুম খেয়ে আদম দুনিয়াতে এলেন। কিন্তু সেই আগমনটাই মানুষের বংশবিস্তার এবং পৃথিবী আবাদ হওয়ার উপলক্ষ হয়ে গেল। এখানেও এক কাজ থেকে আরেকটি বড় কাজ হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর জীবন থেকে একটি উদাহরণ। তিনি বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশ কাফিরদের পক্ষ নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন।

آمده عباس حرب از بهر کین
بهر قمع احمد و استیز دین

আ'মাদে আব্বাস হারব আয বাহরে কীন
বাহরে কামএ আহমাদ ও এস্তিযে দীন
আব্বাস আসেন বদর যুদ্ধে শত্রুতা বিদ্বেষ নিয়ে
মুহাম্মদ e ও ইসলামের উচ্ছেদের সংকল্প বুকে।

گشته دین را تا قیامت پشت و رو
در خلافت او و فرزندان او

গাশতে দীন রা' তা' কিয়া'মত পুশত ও রূ
দার খেলা'ফাত উ ও ফারযন্দা'নে উ
হয়ে গেলেন তিনি দীনের পৃষ্ঠপোষক কিয়ামত তক
তার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ হলো খিলাফতের মসনদ।

বুঝা গেল দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয়। মানুষ চেষ্টা করে একটার জন্য, হয়ে যায় আরেকটা। চেষ্টার ফল প্রকাশ পায় অন্যটা। আরো বড় উন্নত অন্যকিছু। কখনো মনে করে জীবনটা দুর্ভাগ্যের কবলে পুড়ে গেল, কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যই খুলে দেয় তার সৌভাগ্যের কপাল। কাজেই কখনো নিরাশ হতে নেই। ঘটনাপ্রবাহে মানুষের জীবন যেমন বদলে যায় তেমনি তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষও বদলে আরো উন্নত হয়ে যায়।

বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাহ বা ঈশ্বরের কোনো ধারণা নেই। বৌদ্ধ মতবাদের মূল্যবান একটি বক্তব্য হচ্ছে মানুষই সব। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। কিন্তু উপরোক্ত উপমাগুলো প্রমাণ করে, মানুষই একমাত্র সত্য নয়। তার উপরে এক মহাসত্য আছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ কারণেই মানুষ যেটা করতে চায় অনেক সময় সেটা হয় না, হয়ে যায় আরেকটা। এবং তার ফলও হয় অনেক বড় ও উন্নত। কাজেই সবার উপরে মানুষ সত্য, এ কথা সত্য নয়। বরং মনুষের উপরে আছেন এক মহান সত্তা। তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা, কাইয়্যুমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। বুদ্ধিমান লোকেরা তার সাথে হৃদয়ের বন্ধন মযবুত করে। একমাত্র তাকেই ভালোবাসে। তার ভালোবাসার আকর্ষণে তার সৃষ্টির সবকিছুকে ভালোবাসে। বাগদাদে খলীফার দরবারে পৌঁছে বেদুইনের চেতনা আজ সে উপলব্ধিতে উজ্জীবিত।

من برین در طالب چیز آمدم
صدر گشتم چون به دهلیز آمدم

মান বারীন দার তা'লেবে চীজ আ'মাদাম
সাদর গাশতাম চোন বে দাহলীয আ'মাদাম
আমি এই দরবারে এসেছি একটা জিনিসের সন্ধানে
দহলিজে এসে পথ খুঁজে পেয়েছি সৌভাগ্য পানে।

آب آوردم به تحفه بهر نان
بوی نانم برد تا صدر جنان

আ'ব আ'ওয়ারদাম বে তোহফে বাহরে না'ন
বূয়ে না'নাম বুর্দ তা' সদরে জেনা'ন
কলসি ভর্তি পানি এনেছি তোহফা স্বরূপ রুটির আশে
রুটির গন্ধই আমাকে নিয়ে গেছে বেহেশতের পরশে।

نان برون راند آدمی را از بهشت
نان مرا اندر بهشتی در سرشت

না'ন বরুণ রান্দ আদামী রা' আয বেহেশত
না'ন মোরা' আন্দার বেহেশতী দার সেরেশত
রুটি বিতাড়িত করেছে মানুষকে জান্নাতের বাগান হতে
রুটি আমাকে নিয়ে এসেছে আজিকে এখানে বেহেশতে।

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-১৯
[২] সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১০-১৩

এই মাসে এই চাঁদে



মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

মুশরিকদের সকল চুক্তি বাতিল ঘোষিত

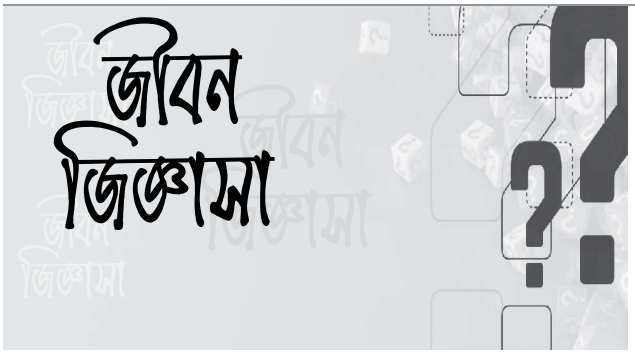
অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে মুশরিকদের কোনো জুড়ি ছিল না। মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ইসলাম-দ্রোহিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ কোন অবস্থায়ই কখনো কোনো সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করেননি। হিজরী ৬ সালে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে বনী খুজাআ মুসলমানদের এবং বনী বকর কুরাইশের মিত্রপক্ষ হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশের এই মিত্র বনী বকর সন্ধির কোনো তোয়াক্কা না করে হঠাৎ বনী মুজাআর উপর হামলা চালায় এবং কুরাইশরাও অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা অত্যাচারী আক্রমণকারীদের সাহায্য করে। অনুরূপভাবে কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা হুদাইবিয়ার সন্ধির উপর কায়িম থাকেনি- সন্ধির বরখিলাফ আচরণ করে। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হিজরী ৮ম সালে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এসব গোত্র ব্যতীত অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে মুসলমানদের সাথে নির্ধারিত মেয়াদের, কিংবা অনির্ধারিত মেয়াদের যেসব চুক্তি ছিল সেগুলোর মধ্যে কেউ কেউ চুক্তিতে স্থির থাকে। আবার বহু গোত্র এমনও ছিল, যাদের সাথে কোন প্রকারের কোনো চুক্তিই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সূরা তাওবার প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

উল্লেখ্য, হিজরী ৮ম সালে মক্কা বিজয়ের পর তখন পর্যন্ত সেখানে উত্তমরূপে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এজন্য সে বছর মুশরিকদের উদ্যোগেই হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। মুসলমানগণ মক্কার আমীর বা শাসনকর্তা হযরত আত্তাব ইবন আসীদ (রা.)-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করেন । নবম হিজরী সালের কথা। এই প্রথম বারের মতো কাবা কুফর ও শিরকের অন্ধকার হতে পবিত্রতা লাভ করে এবং ইবরাহীমী ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়। স্মরণযোগ্য যে, তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যিলকদ কিংবা যিলহজ্জ মাসে তিন শ মুসলমানের একটি কাফেলা মদীনা থেকে হজ্জ করার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। এই কাফেলার নেতা বা আমীরুল হজ্জ ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ছিলেন নকীব প্রতিনিধি (যাঁকে পরে প্রেরণ করা হয়েছিল)। তাছাড়া হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) প্রমুখ মুআল্লিমরূপে প্রেরিত হন। কুরবানী করার জন্য হুযুর (সা.) তাদের সঙ্গে ২০টি উটও প্রদান করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) লোকদের মানাসিকে হজ্জ শিক্ষা দেন, খুতবা প্রদান করেন, যাতে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ছিল। অতঃপর হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে সূরা বারাত (তাওবা) এর চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ হতে ঘোষণা করেন যে, এখন হতে কোনো মুশরিক খানা-ই-কাবায় প্রবেশ করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ অবস্থায় হজ্জ করতে পারবে না। এবং মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে আজ থেকে চার মাস পর বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনো কোনো বর্ণনা মুতাবিক ৯ যিলহজ্জ এই ঘোষণা করা হয়। সুতরাং এই তারিখ থেকে পরবর্তী হিজরী দশ সনের ১০ রবীউস সানী পর্যন্ত চার মাস পূর্ণ হয়। অতএব এ তারিখ হতে মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত অনির্ধারিত মেয়াদের সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়।

তাবুক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে এক লাখ ত্রিশ হাজার শত্রুসৈন্য নিহত

ইসলামের বীর সৈনিক হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও বিশাল বাইজানটাইন বাহিনীর মধ্যে জর্দান এখনকার ইয়ারমুক ময়দানের সংঘটিত যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য মুসলিম অধিকারে আসার সূচনা হয়। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফত আমলে পরিচালিত এটি ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ বিজয় এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খিলাফত আমলের প্রথম যুদ্ধের সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। এই যুদ্ধ চলাকালে খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ইন্তিকাল করেন।

খলীফা প্রথম পর্যায়ে মুরতাদ ও নবুওয়াতের ভণ্ড-দাবিদারদের বিরুদ্ধে সফল নির্মূল অভিযান পরিচালনার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রোমান বাইজানটাইন বাহিনী ও পারস্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণ-প্রস্তুতির মুকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করার পর প্রথম খলীফা ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ হিজরীতে তিনি সিরিয়ায় রোমানদের শক্তি চুরমার করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শক্রমে চারজন সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী গঠন করেন। তাঁরা হচ্ছেন আমর ইবনুল আস (রা.), ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান (রা.) উবাইদা ইবনুল যাররাহ (রা.) এবং শুরাহবিল ইবন হাসানা (রা.)-যথাক্রমে তাঁরা আলাদা আলাদাভাবে ফিলিস্তিন, দামেশক, হিমস ও জর্দানে প্রেরিত হন। সিরিয়ার শাসক হিরাক্লিয়াস এ খবর পেয়ে চারটি মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় স্বতন্ত্রভাবে চারটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। অপরপক্ষে রোমানদের বিশাল বাহিনীর সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখ। এদিকে চারজন মুসলিম সেনানায়ক নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক ময়দানে সমবেত হন। রোমানদের বিপুল সংখ্যক সেনাশক্তির প্রেক্ষিতে আমীরুল মুমিনীন সিদ্দীকে আকবর (রা.) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) কে সকল বাহিনীর সিপাহসালার মনোনীত করেন এবং দশ হাজার সৈন্য সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি পথে সংঘর্ষে লিপ্ত বাহিনীগুলোকে পরাজিত ও পলায়নে বাধ্য করে হিজরী ত্রয়োদশ সালের রবী-১ মাসে ইয়ারমুকে উপনীত হন। এর কিছুদিন পর প্রথম খলীফার ইন্তিকালের পর হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় খলীফা হন এবং তাঁর আমলেই তাবুক যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়। এই যুদ্ধের দীর্ঘ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার এই যে, এক রাতে সিপাহসালার হযরত খালিদ (রা.) অবগত হন যে, ভোরে রোমান বাহিনী আক্রমণ করবে। এ খবর পেয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস সাধন করেন এবং শীর্ষস্থানীয় সকল সৈন্যকে জরুরী নির্দেশাবলী প্রদান করেন। পরের দিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যা এক দিন এক রাত অব্যাহত থাকে। মুসলিম বাহিনীর হাতে রোমান বাহিনী ধ্বংস হতে থাকে এবং মুসলিম বাহিনী অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেন। রোমানদের বিশাল বাহিনীর মধ্যে এক লাখ ৩০ হাজার সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর মাত্র তিন হাজার সৈন্য শাহাদতবরণ করেন। একটি সূত্র অনুযায়ী, তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী ১৫ সালের ২৫ রবি-২ (৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে। তবে এ সম্পর্কে ভিন্ন মতও রয়েছে।



জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

আব্দুল আজীম
সিলেট

প্রশ্ন: আমার এক মামাতো বোন বিবাহিতা। তিনি ও তার স্বামী আমেরিকায় থাকেন। বিয়ের আনুমানিক ৩ বছর পর স্বামীর সাথে মনোমালিন্যের কারণে তিনি (আমেরিকাস্থ) বাপের বাসায় চলে আসেন। প্রায় সাত মাস যাবত তিনি বাপের বাসায় অবস্থান করছেন। এ সময়ের মধ্যে স্বামীর সাথে তার কোনো দেখা সাক্ষাত হয়নি। গত মাসে তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়েছে। এখন তাকে অন্যত্র বিবাহ বসতে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

জবাব: তালাক কিংবা ডিভোর্সের পর একজন মহিলার জন্য ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। উক্ত ইদ্দত তালাক বা ডিভোর্স হওয়ার পর থেকে ধর্তব্য হবে। ঋতুবতী মহিলার ইদ্দত সময়কাল তিনটি হায়িয (ঋতুস্রাব)। আর যদি কোন মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হন, তবে তার ইদ্দতের সময়কাল গর্ভের সন্তান প্রসব পর্যন্ত। অর্থাৎ যখন গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম হবে, তখন ইদ্দত শেষ হবে। আর যদি বয়স কম বা বয়স অধিক হওয়ার কারণে কোনো মহিলার ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তার তালাকের ইদ্দত হবে তিন মাস। এ সম্পর্কে তুহফাতুল ফুকাহা কিতাবে লিখেছেন,

وَأما عدَّة الطَّلَاق فثَلَاثَة قُرُوء فِي حق ذَوَات الْأَقْرَاء إِذا كَانَت حرَّة وَفِي حق الآيسة وَالصَّغِيرَة وَالَّتِي لَا تحيض بعد ثَلَاثِينَ سنة ثَلَاثَة أشهر إِذا كَانَ بعد الدُّخُول بهَا أَو بعد الْخَلْوَة الصَّحِيحَة فِي النِّكَاح الصَّحِيح لِأَنَّهَا توجب كَمَال الْمهْر فتوجب كَمَال الْعدة بطرِيق الأولى احْتِيَاطًا

-তালাকের জন্য ঋতুস্রাব হয় এমন মহিলাদের জন্য ইদ্দতকাল হচ্ছে তিনটি ঋতুস্রাব, যদি সে স্বাধীন হয়। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী কিংবা যে মহিলার ত্রিশ বছর বয়সের পর ঋতুস্রাব হয় না তাদের ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দত তিন মাস, যদি উক্ত তালাক তার সাথে সহবাস বা নির্জনবাসের পর দেওয়া হয়। কেননা এমতাবস্থায় উক্ত নারীকে পূর্ণ মোহর প্রদান আবশ্যক হয়। তাই এজন্য সতর্কতা হিসেবে পূর্ণ ইদ্দত পালন করা উত্তম পন্থায় আবশ্যক। (তুহফাতুল ফুকাহা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন,

وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ) بَعْدَ (الْمَوْتِ) عَلَى الْفَوْرِ (وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَإِنْ جَهِلَتْ) الْمَرْأَةُ (بِهِمَا) أَيْ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ لِأَنَّهَا أَجَلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمُضِيِّهِ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ أَنْكَرَ.

-ইদ্দত শুরু হয় তালাক বা মৃত্যুর পর অবিলম্বে এবং ইদ্দত যথাসময়ে সমাপ্ত হয় যদিও মহিলা তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত না হয়। কেননা তা নির্দিষ্ট সময়কে বলা হয়, যা অতিবাহিত হওয়ার জন্য অবগতি থাকা শর্ত নয়। তদ্রুপ স্বামী উক্ত তালাক স্বীকার করুক বা না করুক। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২০)

মাহবুবুর মতলিব
মিশিগান, ইউএসএ

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় হাতে ডায়মন্ডের আংটি পরিধান করার বিধান কী? ভুলবশতঃ ইহরাম অবস্থায় আংটি হাতে রয়ে গেলে ইহরামের কোনো ক্ষতি হবে কি?

জবাব: ইহরাম অবস্থায় আংটি হাতে রাখা জায়িয। তবে অনুত্তম। এতে ইহরামের কোনো ক্ষতি হয় না এবং কোনো দম কিংবা সাদকাহ দিতে হয় না। সহীহ বুখারী গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে-

باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا

(সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬; باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ)

এ সম্পর্কে বাদাইয়ুস সানাঈ কিতাবে লিখেছেন,

وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْصِدُ بِهِ التَّغْطِيَةَ كَإِجَّانَةٍ، أَوْ عِدْلِ بَزٍّ وَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ لُبْسًا، وَلَا تَغْطِيَةً.

(বাদাইয়ুস সানাঈ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫)

ফাতহুল মুনইম কিতাবে লিখেছেন,

قال العلماء: لا بأس للمحرم بالهميان والخاتم، وأجازوا عقد الهميان إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، ونقل عنه جوازه

(ফাতহুল মুনইম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০)

মাওলানা সৈয়দ মারুফ আহমদ
কাতার

প্রশ্ন: কোনো মসজিদের বিরুদ্ধে উক্ত মসজিদ থেকে ঝগড়া করে বের হয়ে যাওয়া কয়েকজন মুসল্লি কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদ কমিটি মসজিদের পক্ষে মামলা চালাতে প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহে মসজিদের ফান্ডের টাকা খরচ করতে পারবে কি?

জবাব: মামলাটি যদি সরাসরি মসজিদের বিপক্ষে হয় এবং সেটা অসত্য তথা মিথ্যা বা বানোয়াট হয়, তাহলে মসজিদের পক্ষে সুবিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে মামলার ব্যয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খরচাদি ফান্ড থেকে নেয়া যাবে। কেননা এটা মসজিদ সংশ্লিষ্ট আনুসাঙ্গিক খরচের আওতাভুক্ত । আর যদি উক্ত মামলা মসজিদ কমিটির স্বেচ্চাচারিতার বিরুদ্ধে কিংবা কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় মসজিদের ফান্ডের টাকা ব্যবহার করা অবৈধ। যেহেতু মসজিদের ফান্ডে যারা দান করেন তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মসজিদ ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট খাতে তা ব্যয় করা। তাই মসজিদ কিংবা মসজিদ সংশ্লিষ্ট খাত ব্যতীত ভিন্ন খাতে মসজিদের ফান্ড থেকে ব্যয় অবৈধ। এ সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

انَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُرَاعَاةَ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ وَاجِبَةٌ

-ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে, দাতাদের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নেওয়া বাধ্যতামূলক। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)

উক্ত কিতাবে আরো এসেছে-

شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ

-ওয়াকফের দাতার শর্ত শরীআত প্রণেতার ভাষ্যের মত (অপরিহার্যভাবে) গৃহীত। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬)

নাসির উদ্দিন
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: নামাযের শেষ বৈঠকে উযূ ছুটে গেলে কীভাবে নামায সম্পন্ন করতে হবে? জানতে চাই।

জবাব: নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর অনিচ্ছায় উযূ ছুটে গেলে নামাযের সকল ফরয আদায় হয়ে গেলেও দুইটি ওয়াজিব কাজ বাকী থাকে । ১. নিজের কোনো কাজের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া, যা ওয়াজিব।

২. সালাম ফিরানো ওয়াজিব। যেহেতু সে নিজের কোনো কাজের মাধ্যমে নামায বের হয়নি এবং শেষে সালামও ফিরায়নি। তাই তাকে উযূ করে এসে পুনরায় সে নামায পড়তে হবে। আর যদি ইচ্ছা করে উযূ ভঙ্গ করে, তাহলে নিজের ফেল তথা কাজের মাধ্যমে বের হয়েছে। কিন্তু ওয়াজিব আমল সালাম ফিরায়নি। তাই ঐ নামায ওয়াক্তের মধ্যে পুনরায় আদায় করতে হবে।

এ সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

(و) اعْلَمْ أَنَّهُ (إنْ تَعَمَّدَ عَمَلًا يُنَافِيهَا بَعْدَ جُلُوسِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ) وَلَوْ بَعْدَ سَبْقِ حَدَثِهِ (تَمَّتْ) لِتَمَامِ فَرَائِضِهَا، نَعَمْ تُعَادُ لِتَرْكِ وَاجِبِ السَّلَامِ

(রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০৬)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন: মুসাফিরের নামাযের বিধান কী?

জবাব: মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকাত পড়বে। এটিকে কসর নামায বলে। মুসাফিরের জন্য কসর পড়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১; আল মুহীতুল বুরহানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১)

মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায (নির্দিষ্টভাবে) ফরয নয়। বরং জুমুআ কিংবা যুহরের যেকোনটি আদায় করলে দায়িত্বমুক্ত হবেন। তবে সুযোগ থাকলে জুমুআ পড়ে নেওয়া উত্তম। অনুরূপ ঈদের নামায মুসাফিরের জন্যে ওয়াজিব নয়। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫; আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)

উল্লেখ্য যে, ফজর, মাগরিব এবং বিতর নামাযে কোনো কসর নেই।

প্রশ্ন: ব্যক্তি কতটুকু সফর করলে মুসাফির বিবেচিত হবে?

জবাব: সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ৪৮ মাইল (৭৭.২৫ কিলোমিটার) কিংবা ততোধিক দূরত্বের কোন স্থানে সফর করার নিয়তে নিজ লোকালয় থেকে বের হলে সে শরীআতের পরিভাষায় মুসাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

এ সম্পর্কে 'আল হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদীনাহ' কিতাবে লিখেছেন,

قَالَ ابو حنيفَة لَا تقصر الصَّلَاة فِي اقل من ثَلَاثَة ايام ولياليها بسير الابل وَمَشى الاقدام – وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تقصر الصَّلَاة فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا

-ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, পায়ে হেটে কিংবা উটে চড়ে তিনদিন ও তিনরাত্রির দূরত্ব পরিমাণের কম ভ্রমণে নামায কসর করা যাবে না। আর আহলে মদীনা বলেন, চার বরীদ পরিমাণ দূরত্ব তথা ৪৮ মাইল পরিমাণ হলে নামায কসর পড়া হবে। (আল হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদীনাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬; আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯)

প্রশ্ন: মুসাফিরের ক্ষেত্রে সুন্নাত নামাযের বিধান কী?

জবাব: সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ব্যতীত সাধারণ সুন্নাত কিংবা নফল নামায আদায় করা কিংবা না করার ইখতিয়ার সর্বাবস্থায় সকলের রয়েছে। তবে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায মুসাফির ব্যক্তির জন্য আদায় করা অপরিহার্য কিনা- এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায মুকীম ও মুসাফির সকলের জন্যে পড়া বাঞ্চনীয়। আবার কারো কারো অভিমত হচ্ছে- মুসাফিরের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায অপরিহার্য নয়। অন্যান্য সাধারণ সুন্নাত ও নফলের মতো ওজর ব্যতীত ছেড়ে দেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী মুসাফির ব্যক্তি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায শান্তি ও স্বস্তিতে অবস্থানকালীন সময়ে আদায় করবে। অন্যথায় পথ চলার ব্যস্ততা কিংবা সময়ের স্বল্পতা বা অন্য যেকোন ওজরে ছেড়ে দেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। এ সম্পর্কে 'আদ দুররুল মুখতার' গ্রন্থকার লিখেছেন,

ويأتي المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لانه ترك لعذر.

-গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী মুসাফির নিরাপদ ও স্বস্তির সাথে অবতরণ বা অবস্থানকালীন সময়ে সুন্নাত (মুআক্কাদাহ) নামায পড়বেন। অন্যথায় পথ চলাকালীন সময়ে সুন্নাত পড়বেন না। কেননা তা ওজরে ছেড়েছেন। (আদ দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬)

'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লিখেছেন,

وَقِيلَ الْأَفْضَلُ التَّرْكُ تَرْخِيصًا، وَقِيلَ الْفِعْلُ تَقَرُّبًا. وَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ: الْفِعْلُ حَالَ النُّزُولِ وَالتَّرْكُ حَالَ السَّيْرِ، وَقِيلَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ خَاصَّةً، وَقِيلَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا بَحْرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْأَعْدَلُ مَا قَالَهُ الْهِنْدُوَانِيُّ.

-কেউ কেউ বলেছেন, রুখছতের উপর আমল হিসেবে না পড়াই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নৈকট্যের ওয়াসীলাহ হিসেবে পড়াই ভালো। আর হিন্দওয়ানী বলেছেন, গন্তব্যে অবস্থানকালীন সময়ে এর আমল করা হবে এবং পথ চলাকালীন সময়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে। আবার কেউ বলেছেন, বিশেষত, ফজরের সুন্নাত পড়া অপরিহার্য। কেউ কেউ আবার মাগরিবের সুন্নাতও পড়া লাগবে বলেছেন। (বাহরুর রাইক) শরহুল মুনীয়াহ গ্রন্থকার বলেছেন, আল্লামা হিন্দওয়ানীর মতামত এক্ষেত্রে অত্যধিক ন্যায়সঙ্গত। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১)

মারুফ আহমদ
বালাগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: নামাযের সিজদায় কয়টি অঙ্গ মাটিতে রাখা ফরয?

জবাব: সিজদাহ অবস্থায় কপাল ও নাক মাটিতে লাগানো অপরিহার্য। এতদুভয়ের দ্বারা সিজদাহ পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে 'আল মাবসূত' কিতাবে লিখেছেন:

وَيَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَاظَبَ عَلَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تَمَامُ السُّجُودِ

-মুসল্লি তার কপাল ও নাকের উপর ভর করে সিজদাহ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা এ নিয়মে সিজদাহ করতেন। আর এর মধ্যেই সিজদাহ পরিপূর্ণতা লাভ করে। (আল মাবসূত লিস সারাখশী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪)

উভয় হাতলী, হাটুদ্বয়, পদযুগল ইত্যাদি অঙ্গসমূহ সিজদাহকালীন সময়ে মাটিতে লাগানো সুন্নাত ও সিজদাহর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী সহায়ক বিষয় হিসেবে পরিগণিত। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে-

عَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ

(সুনান তিরমিযী, হাদীস-২৭২)

অভ্যন্তরীণ

যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত

মাহে রবীউল আউয়াল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি মাস। এ মাসেরই ১২ তারিখের সুবহে সাদিকের শুভলগ্নে ধরাধামে তাশরীফ আনেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সায়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতাল্লিল আলামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। সারা বিশ্বের মুসলমানরা এই দিনটিকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) হিসেবে উদযাপন করেন। এর ধারাবাহিকতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশেও ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রবীউল আউয়াল পুরো মাসজুড়ে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দুরুদ পাঠ, র‍্যালি, নাত মাহফিল, সীরাত মাহফিল, দান-খয়রাতসহ নানা আয়োজন করে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। ১২ই রবীউল আউয়াল ছিল সরকারি ছুটির দিন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পৃথক বাণী প্রদান করেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন র‍্যালি, সীরাত মাহফিল, আলোচনা সভা, সেমিনার, নাত মাহফিলের আয়োজন করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নানা আয়োজন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৬ হিজরী উপলক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল ১৫ দিনব্যাপী ওয়াজ, মীলাদ ও দুআ মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথ প্রযোজনায় সেমিনার, ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আরবি খুতবা লিখন প্রতিযোগিতা, কিরাত মাহফিল, স্বরচিত কবিতা পাঠের মাহফিল, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ইসলামী বইমেলা, বিশেষ স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি। ১৪ সেপ্টেম্বর, বাদ মাগরিব বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব গেইটে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫৪টি ইসলামিক মিশন ও ৮টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

সিলেটে তালামীযে ইসলামিয়ার র‍্যালি

রাসূল (সা.) সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আদর্শ

হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

আধ্যাত্মিক রাজধানী পূণ্যভূমি সিলেট নগরীতে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে 'মুবারক র‍্যালি' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া'র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) র‍্যালি বাস্তবায়ন কমিটি সিলেট আয়োজিত এ র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য সকাল থেকেই নগরীর সোবহানীঘাটস্থ হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা জমায়েত হন। সকাল ১০টা থেকে যুহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রিয়নবী (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আনজুমানে আল ইসলাহ ও তালামীযে ইসলামিয়ার বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও আগত অতিথিবৃন্দ। বাদ যুহর র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রিয়নবীর শানে রচিত কালজয়ী নানা কবিতার শ্লোক অঙ্কিত নানা রঙের ফেস্টুন ও প্লেকার্ড র‍্যালিতে শোভাবর্ধন করে। আশিকে রাসূল ছাত্রজনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় প্রিয়নবীর প্রশংসাগীতি। সালাম সালাম নবী সালাম সালাম, মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম, বালাগাল উলা বি-কামালিহি, শামসুদ্দোহা আসসালাম- এরকম অগণিত নাত-এর সুমধুর সুর লহরি নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে।

র‍্যালিপূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল ইসলামী এর চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবতার এক চরম ক্রান্তিলগ্নে এ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। পাপে-তাপে পরিপূর্ণ পৃথিবীর বুকে তিনি ন্যায়-ইনসাফ, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষে মানুষে সকল ভেদাভেদ দূর করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে সমাজ কায়েম করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি স্থান-কাল নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁর আদর্শের আলোকে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তারা বলেন, রাসূলে পাক (সা.) এর শুভ জন্মের মাসে আনন্দ প্রকাশ করা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কর্মসূচিরই অংশ। রাসূল (সা.) এর জন্মের ইতিহাস, জীবনাদর্শ, জীবনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক আলোচনা করে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার অনন্য সুযোগ এটি। রাসূলে পাক (সা.) এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ আমরা আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে পেয়েছি। তাই তাদের কাছেও আমরা ঋণী। বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামের শানে বেয়াদবিমূলক কথা বলছে। এটি রাসূলে পাক (সা.) এর আদর্শ থেকে মুসলমানদেরকে সরানোর অপচেষ্টা কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বক্তারা সালফে সালেহীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথে রাসূল (সা.) এর আদর্শে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানান।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা কমরুদ্দীন চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে ফুলতলী, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহবুবুর রহমান ফরহাদ। র‍্যালি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এস এম মনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব হুসাইন আহমদ এর পরিচালনায় র‍্যালি পূর্ব আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা একেএম মনোওর আলী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকিব, আনজুমানে আল ইসলাহর সহ-সভাপতি মাওলানা জ.উ.ম আব্দুল মুনঈম মনজলালী, মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. মাওলানা মঈনুল ইসলাম পারভেজ, মাওলানা মাহমুদ হাসান চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শেহাব উদ্দিন আলীপুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা নজমুল হুদা খান, অর্থ সম্পাদক মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আবু ছালেহ মো. কুতবুল আলম, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনজুরুল করিম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে জশনে জুলুস

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও ঢাকা ও চট্টগ্রামে জশনে জুলুস বের করে আঞ্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট। ১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকালে জশনে জুলুস ঢাকার মোহাম্মদপুরের কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মাদ্রাসা ময়দানে যায়। পরে সেখানে বিশাল মাহফিল করা হয়। এছাড়াও আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নগরীতেও জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে জশনে জুলুস বের হয়। এতে লাখো মানুষ অংশ নেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মীলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এবার দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.)। ১৬ সেপ্টেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদুল জামি'আয় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, মীলাদ ও দুআ মাহফিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে শত কণ্ঠে নাতে রাসূল গেয়ে র‍্যালি করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আরবি সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে বটতলায় কুরআন তিলাওয়াত ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর টিএসসিতে আয়োজিত হয় কাওয়ালী সন্ধ্যা। এছাড়াও মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রায় ৫ হাজার মানুষকে খাওয়ানোর আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজনে মীলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আলোচনা সভা ও দুআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নানা আয়োজনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে হাম-নাত ও উর্দু গজল পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীরা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কাওয়ালী ও সীরাত মাহফিলের আয়োজন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ।এছাড়াও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা আয়োজনে উদযাপিত হয় ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.)।

এনসিটিবির সমন্বয় কমিটি

গত ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু কমিটি গঠনের পরপরই তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। কমিটির দুই সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুনের বিরুদ্ধে 'ইসলামবিদ্বেষের' অভিযোগ তোলে ধর্মপ্রাণ মানুষ। এসকল তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি ১৩ দিনের মাথায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাতিল করে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক অফিস আদেশে কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তবে এ নিয়েও দেশের ১২২ নাগরিক প্রতিবাদ জানান। তারা পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে কমিটি পুনর্বহালেরও দাবি জানান । তারা তাদের দাবিতে গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে ধর্মের নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ফ্যাসিবাদের জায়গা দখল করেছে বলে দাবি করেন। তাদের এ দাবি কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

পয়ত্রিশ আন্দোলন

গত বেশ কিছুদিন ধরে চাকরি প্রত্যাশীরা চাকরির বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবি জানিয়ে আসছেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে সরাসরি কথা বলার কথা ব্যক্ত করা হয়। এজন্য আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেন। তবে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টার দিকে আন্দোলনরতদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং লাটিচার্জ করে পুলিশ। পুলিশের এমন পদক্ষেপের পর আন্দোলনকারীরা আরও জোরালো অবস্থান নেন। তবে ঐদিনই বিকালের দিকে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনার জন্য প্রবেশ করেন আন্দোলনকারীদের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। বৈঠকে দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রধান উপদেষ্টা আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান আন্দোলনের সমন্বয়ক রাসেল আল মাহমুদ। করোনা মহামারী পরিস্থিতি সহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে চাকরির বয়স ৩৫ বছর করার দাবি জানিয়ে আসছেন তারা।

প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফর

গত কয়েকদিন থেকে দেশে আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর যুক্তরাষ্ট্র সফর। কেননা এটি ছিল দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম বিদেশ সফর, এছাড়াও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে তাঁর বৈঠক থাকার কারণে সফরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি এবং নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফে সহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাইডলাইনে ৪০টি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন। প্রধান উপদেষ্টার এ সফর নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ কষছেন বিশ্লেষকরা। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি মার্কিন সরকারের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে এ সফরের মাধ্যমে।

সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা

১৭ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীকেও সারাদেশে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার বা বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মানে হলো, সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিমান ও নৌ বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসাররা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় সশস্ত্র বাহিনীর (সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব সমমর্যাদার) কমিশনপ্রাপ্ত অফিসাররা এ ক্ষমতা পাবেন এবং প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে পরবর্তী ৬০ দিন পর্যন্ত এ ক্ষমতা কার্যকর থাকবে। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের দ্বারা পুলিশ বাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বিগত ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের নির্মমতা সবকিছুকে হার মানায়। ফলে সরকার পতনের দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পুলিশ বাহিনী সেভাবে গুছিয়ে উঠতে পারেনি বলেই ধারণা করা হয়। এর ফলেই সশস্ত্র বাহিনীর হাতে একরকম বাধ্য হয়েই বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করেছে সরকার।

প্লাবিত উত্তরবঙ্গ

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অতিবর্ষণ ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল স্রোতে উত্তরের জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়; নদীগুলোতে দেখা দেয় ভাঙ্গন। মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে উঁচু স্থানে ও বাঁধে আশ্রয় নেন। ওই অঞ্চলে দেখা দেয় বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট। কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এর ভাষ্যমতে, জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা, ধরলা, দুধকুমারসহ সবগুলো নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।প্লাবিত জেলাগুলোর অনেক জায়গায়ই এখনো পানির নিচে রয়েছে। পানিবন্দি রয়েছে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ। রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের প্রায় ৬৪ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। এসকল দুর্গত এলাকায় আবাদি জমির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের পানি আগ্রাসন যেন থামছেই না, বরং দুঃখজনকভাবে অব্যাহত রয়েছে। আবারো তারই নমুনা পরিলক্ষিত হলো। অতি সম্প্রতি ভারতের ডম্বুর বাধ বাংলাদেশকে না জানিয়ে খুলে দেওয়ায় অসময়ে প্লাবিত হয় সীমান্তবর্তী জেলা ফেনী ও কুমিল্লা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো ভারতের পানিতে প্লাবিত হলো উত্তরবঙ্গ।

এই মাসের ৭ তারিখে ফিলিস্তিনে চলমান আল আকসার তুফানের এক বছর পূর্ণ হবে। এক বছর যাবত এই যুদ্ধ থামাতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও প্রধানত ইসরায়েলের অনিচ্ছা আর মার্কিন তথা পশ্চিমাদের ইসরায়েলের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন কোন উদ্যোগকেই সফল হতে দেয়নি। গত সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে যুদ্ধবিরতির নানা আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত কোন উদ্যোগই সফল হয়নি। এমনকি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির আলোচনায় শতকরা ৯০ভাগ ঐকমত্য হয়ে গেছে, কিন্তু মাসের শেষ দিনেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র 'বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আছে' বলে দায় সেরেছেন। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন চলাকালেও ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি ছিল অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেখানেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়।

ফিলিস্তিনে একের পর এক ভয়ঙ্কর হামলা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি এ মাসে লেবাননেও যুদ্ধপরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর লেবাননে ইসরায়েলের পূর্ণমাত্রায় আকাশ হামলা শুরুর পর ২৪ তারিখে এক দিনে লেবাননে সাড়ে পাঁচ শতাধিক বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু ঘটে ইসরায়েলের হামলায়, যা শুধু লেবাননে নয়; গাজার পরিস্থিতি বিবেচনায়ও এক দিনে সর্বাধিক বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনাসমূহের একটি। তার কয়েক দিন পর লেবাননের সশস্ত্র প্রতিরোধযোদ্ধা গোষ্ঠী হিযবুল্লাহ-এর মহাসচিব হাসান নসরুল্লাহসহ অসংখ্য সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে ইসরায়েল, যা ইরান সমর্থিত প্রতিরোধযোদ্ধাদের এই যুদ্ধের সর্বোচ্চ ক্ষতি বলে বিবেচিত হচ্ছে। এর আগে ইসমাইল হানিয়ার শাহাদতের পর এটিই চলমান যুদ্ধপরিস্থিতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড এটি । লেবাননে এখন ফিলিস্তিনের মতোই যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ইসরায়েলের। চলতি মাসে তাই ইসরায়েল লেবাননে স্থল হামলা চালিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, এর আগে মধ্য সেপ্টেম্বর লেবাননে হিযবুল্লাহর যোগাযোগরে জন্য মোবাইলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত ডিভাইসে 'পেজার' বিস্ফোরণে অন্তত পক্ষে ২০ জনের মৃত্যু ও প্রায় ৫০০ মানুষ আহত হয়েছিলেন, আহতদের মধ্যে লেবাননে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মুজতবা আমানিও রয়েছেন। এসকল ডিভাইসের মধ্যেই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মোসাদ বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ৭ অক্টোবর আল আকসার তুফান শুরুর এক দিন পর ৮ অক্টোবর থেকেই হিযবুল্লাহ বিভিন্ন ইসরায়েলি স্থাপনাকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা করছে, তার জবাবে ইসরায়েলও একই রকম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই হামলা-প্রতি হামলায় এক ধরনের অঘোষিত নিয়ম উভয় পক্ষই মেনে চলছিল, নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোন পক্ষই অপর পক্ষের উপর হামলা করছিল না। হিযবুল্লাহ কিংবা ইরানেরও এর বাইরে গিয়ে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নেতানিয়াহুর নিজস্ব রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ ভিন্ন হওয়াতে ইসরায়েল নিজে থেকেই লেবাননে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু করে। ইসরায়েল এর আগে ২০০৬ সালে লেবাননে সামরিক প্রবেশ করলেও শেষ পর্যন্ত হিযবুল্লাহকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২০০৬ সালের পর এবারই প্রথম লেবাননের মাটিতে ইসরায়েল হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে স্থল যুদ্ধে নামছে। বলাই বাহুল্য হিযবুল্লাহ হামাসের চেয়ে শক্তিশালী তো বটেই, এমনকি বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহের বাইরে তাদের চেয়ে শক্তিশালী কোন শক্তি নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। এই পরিস্থিতিতে স্থলযুদ্ধে সামরিকভাবে হিযবুল্লাহকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব জেনেওর রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ মেলাতে গাজায় ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী বিজয় নিশ্চিত করতে না পারার ব্যর্থতাকে ঢাকতে নেতানিয়াহুকে সেখানে প্রবেশ করতে হচ্ছে। এতে হিযবুল্লাহকে পরাস্ত করা সম্ভব না হলেও লেবাননের বেসামরকি নাগরিকদের জীবনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা নেমে আসবে। হিযবুল্লাহ মূলত এর আগে ২০০৬ সালে ইসরায়েলকে লেবানন থেকে বিতাড়িত করে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, আর সে কারণেই তারা লেবাননের মাটিতে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল।

হাসান নসরুল্লাহর মৃত্যুতে ইরান-লেবানন-হামাস-হুথিসহ পুরো প্রতিরোধ অক্ষই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নিঃসন্দেহে, তবে হিযবুল্লাহর মতো জনপ্রিয় সশস্ত্র সংগঠন এর ফলে আরো শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে এখন ইসরায়েল গাজার পাশাপাশি লেবাননেও পুরোদমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শক্তিশালী উদ্যোগের অভাবে সহসাই এই যুদ্ধে কোন বিরতির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ইসরায়েলের সেনাপ্রধান চিফ অব স্টাফ হারজি হালেভি পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ তিনি পদত্যাগ করবেন বলে জানা যায়। সেনাপ্রধানের এ ঘোষণা নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে কিছুটা বিপাকে ফেলেছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এখন মূলত বিশ্বনেতাদের পিকনিকের ক্লাবে পরিণত হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো প্রথার কারণে। তারপরও এর প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পরিষদের অধিবেশনের প্রতি অনেকেরই নজর ছিল। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও বেশির ভাগ দেশ ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছে, যদিও নিরাপত্তা পরিষদের ভেটোর বাধায় এ বিষয়ে সাধারণ পরিষদের কোন আলোচনাই বাস্তবায়িত হবে না।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের দখলদারিত্বকে অবৈধ ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত কর্তৃক গত ১৯ জুলাই প্রদত্ত পরামর্শমূলক মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। আর এ সমর্থনে ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের চলমান ১০ম বিশেষ জরুরি অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়েছে। ফিলিস্তিন কর্তৃক উপস্থাপিত রেজ্যুলেশনটি বাংলাদেশসহ ৫৩টি দেশ কো-স্পন্সর করে । রেজ্যুলেশনটি ভোটের জন্য উপস্থাপিত হলে ১২৪টি দেশ এটির পক্ষে ও ১৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট প্রদান করে এবং ৪৩টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। কো-স্পন্সর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রেজ্যুলেশনটির পক্ষে ভোট দিয়েছে। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধা হামাস এ প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে।

তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান এবার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিনঘনিষ্ট বলে পরিচিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস যেভাবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ইসরায়েলের সমালোচনা করে যুদ্ধবিরতির আহ্বান করেছেন, তা অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। মার্কিনঘনিষ্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সাথে মিল রেখে তিনি কথা বলবেন, এমনটা অনেকেরই ধারণা ছিল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুস অবশ্য এবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের অন্যান্য সরকার প্রধানদের চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন বিশ্বনেতাদের সাথে তার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কূটনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে "চলো মুম্বাই" আন্দোলন বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে বিশেষভাবে। রামগিরি মহারাজ নামক মহারাষ্ট্রের এক হিন্দু ধর্মগুরু গত আগস্ট মাসে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করলে এর বিরুদ্ধে সেখানকার মুসলিম সমাজ প্রতিবাদ করে। এতে ভারতের শাসক দল বিজেপির নেতা নীতেশ রানে পাল্টা মন্তব্য করেন যে, 'রামগিরি মহারাজের কোন ক্ষতি করার দুঃসাহস দেখালে আমরা তোমাদের মসজিদে ঢুকে একজন এক জন করে হত্যা করবো।' এতে বিক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে মুসলিম সমাজ 'চলো মুম্বাই' নামে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন করে এবং এতে লাখ লাখ ভারতীয় মুসলিম অংশগ্রহণ করেন। এর প্রভাব আছড়ে পড়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সিলেটে বাংলাদেশে আনজুমানে তালামীয়ে ইসলামিয়ার ডাকে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ভারতীয় মুসলিমদের সমর্থনে ও উগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেন।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলায় এক নির্বাচনি জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে রাজ্যটিতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনের পর বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এমন হুঁশিয়ারি দেন প্রভাবশালী এই নেতা । খবর দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইনের। এই নেতা বলনে, 'আমি সবার কাছে ঝাড়খন্ডে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। আমরা প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিককে উলটো করে ঝুলিয়ে রেখে একেবারে সোজা করে দেবো।'



কবিতা

পীরানে পীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (র.)
কাব্যানুবাদ: মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান

গাউসুল আযম আব্দুল কাদির পীরানে পীর দস্তগীর
আউলিয়ার মুক্তাদা তুমি বন্ধু মাবুদ ইলাহীর।

মুর্দা তুমি করলে যিন্দা বলে কুম বিইযনিল্লাহ
তোমার বারকী তাজাল্লীতে সারা জাহান হয় মুনীর।

খোদার বন্ধু হৃদে তোমার তুফান ইশকে রাসুলের
ওলীদের শাহানশা তুমি মুজতাবা পীরানে পীর।

ছিলে তুমি মগ্ন-বিভোর আল্লাহ তাআলার ইয়াদে
মুরাকাবায় নির্জনতায় বিশ্বে তুমি বেনজীর।

চক্ষে কাবার ছবি নিয়ে ধ্যানে ছিলে দীর্ঘকাল
খোদার নূরের তাজাল্লীতে হলে রৌশনজমীর।

কাবার পাথর আছে ঢাকা পর্দা দিয়ে মখমলের
দুধের প্রতি ফোটার মাঝে সুপ্ত যেমন রয় পনীর।

সামনে ছিল কাবা বটে লক্ষ্য তো কাবা নাওয়াজ
চশমা চোখে তবু যেমন তীরই লক্ষ্য শিকারীর।

ছিল আল্লাহ তাআলার সাথে টান হৃদয়ের দুর্নিবার
নিনে নেন মাদিনা থেকে বাশারত থেকে বশীর।

মাহবুবের খুশবু কলন্দর বাগদাদের গুল বাগিচায়
কুল আলমে সবার কাছে খ্যাত নামে দস্তগীর।

মুসলিম মহিমা

আ. শ. ম. বাবর আলী

মুসলিম বলে নিজকে নিয়ে গর্ব করো ভাই
মুসলিম গুণ কোনটি আছে জানতে শুধু চাই।
হারাম খাদ্যে উদর ভরে বাড়াও দেহের পেশী
কাতরে মরে ক্ষুধায় তোমার ভূখা প্রতিবেশী।
অতিষ্ঠ হয় তোমার স্বজন তোমার ব্যবহারে
অশ্রু ঝরে তাদের চোখে তোমার অত্যাচারে।
তোমার মুখের রূঢ় কথায় সকলে পায় ভয়
মিষ্টিমুখে কথা বলা তোমার স্বভাব নয়।
করলো যারা তোমায় আঘাত করলে না তায় ক্ষমা
দিনে দিনে পাপের বোঝা করলে শুধু জমা।
দীল খুলিয়া সর্বজনে বাসলে নাকো ভালো
অজ্ঞ সমাজ মাঝে তুমি জ্বাললে নাকো আলো।
দুঃখীজনের দুঃখ দেখে কাঁদলো নাতো প্রাণ
তোমার সুখের একটু তাদের করলে নাকো দান।
ভাগ্যহত তোমার পাশে দেখলে তুমি যতো
অবহেলায় ঠেললে পায়ে অর্বাচীনের মতো।

আল্লাহ ভুলে যেয়ে তুমি শক্তি করে সেবা
ধর্মহীন আর তোমার মত আছে বলো কেবা?
বিশ্বনবীর শিক্ষা তুমি আজকে গেছো ভুলে
অন্যায় আর অসত্যরে নিচ্ছে বুকে তুলে।
সত্যটারে দূরে ঠেলে মিথ্যার গাও জয়
জেনে রাখো মুসলিম হওয়ার চিহ্ন এটা নয়।
মিথ্যাটারে ছেড়ে দিয়ে সত্য সে পথ ধরো
সবার জন্য কল্যাণ যা সেই সে কর্ম করো।
খোদার ওপর ভরসা রেখে কুরআন হাদীস মানো
রাসূল দিলেন সত্যের পথ অন্তরেত জানো।

এসব কিছু মেনে তুমি চলতে যদি পারো,
তুমিই হবে খাঁটি মুসলিম সন্দেহ নেই কারো।
জীবন তোমার ধন্য হবে দুঃখ যাবে সরে,
শান্তি সুখের বইবে জোয়ার প্রতি ঘরে ঘরে।



গল্প

মুক্তা

মুহাম্মাদ উসমান গণি

এক ছিলেন আবিদ। ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল করেই তার কাটতো অধিকাংশ সময়। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে স্ত্রীকে নিয়ে চরকায় সুতা কাটতেন এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই কোনোমতে তারা দিনাতিপাত করতেন।

এভাবেই চলছে তাদের নিত্যদিনের কাজকর্ম। তাদের নেই কোনো সন্তান-সন্ততি। দুজনই জীবন যুদ্ধের শেষ প্রান্তে। কিন্তু এতে তাদের নেই কোনো মনের অসন্তুষ্টি বা হতাশা। একদিনের ঘটনা। স্ত্রী চরকা কেটে সুতা তৈরি করে দিলেন বাজারে বিক্রির জন্য। বললেন, ঘরে কোনো খাবার দাবার নেই, সুতার বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে যেন কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসেন। তিনি সুতা নিয়ে বাজারে গেলেন এবং সুতা বিক্রি করলেন। হাতে টাকা পেয়ে খুব আনন্দচিত্তে চললেন খাবার কিনতে। পথিমধ্যে দেখা হয় এক অসহায় ব্যক্তির সাথে। লোকটি বৃদ্ধের কাছে হাত পেতে বলে, বিশ্বাস করুন! আমার ঘরে স্ত্রী সন্তান সবাই ক্ষুধার্ত। ঘরে এমনকিছু নেই যে বিক্রি করব। কাজের জন্য বের হয়েছি কিন্তু কেউ কোনো কাজও দেয়নি। যদি দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করতেন। অসহায়ের অসহায়ত্বের কথা শুনে বৃদ্ধ আবিদ লোকটির মন নরম হয়ে গেল। সাথে সাথে সুতা বিক্রির পুরো টাকাটাই দান করে দিলেন লোকটিকে। কিন্তু তিনি একদম ভুলে গেলেন যে, তার ঘরেও কোনো খাবার নেই। অগত্যা খালি হাতেই বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রীকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। স্ত্রীও এতে কোনো আপত্তি করলেন না। দুজনেরই পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। ভাবছেন কী করা যায়। অনেক খুঁজাখুঁজির পর ঘরে পেলেন একটি ভাঙা বাটি আর পুরনো একটি কলস। যেহেতু ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে সেহেতু এগুলো বিক্রি করে খাবার কেনার ব্যবস্থা করার চিন্তা করলেন। বৃদ্ধ দুটি জিনিস নিয়ে বাজারে গেলেন। অনেক সময় বসে থাকার পরও পুরনো বলে এই বাটি আর কলস কেউ কিনতে রাজি হয় না। এভাবেই অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন বৃদ্ধ। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে এক মাছওয়ালাকে হেঁটে যেতে দেখলেন। তার কাছে আছে বড় একটি মাছ। কিন্তু তার মাছটিও কেউ কিনতে রাজি হয়নি কারণ তার মাছটি দীর্ঘসময় রাখার কারণে খুব নরম হয়ে গিয়েছে।

মাছওয়ালা বৃদ্ধকে বললো, দেখেন, আপনার এই পুরনো বাটি আর কলস কেউ কিনবে না। আর আমার এই পঁচা মাছও কেউ কিনবে না। দুজনের জিনিসই প্রায় অকেজো। তারচেয়ে বরং আমরা এক কাজ করি দুজন দুজনের জিনিসটাকে অদলবদল করে ফেলি। বৃদ্ধের কাছে মাছওয়ালার কথাটি খুব পছন্দ হলো। বাটি ও কলসের বিনিময়ে মাছ নিয়ে বাড়ি পৌঁছলেন। স্ত্রীর হাতে মাছ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখো এটি খাওয়ার উপযোগী কি না? কোনোমতে ক্ষুধা নিবারণ করো। দেখা যাক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী ব্যবস্থা করেন। কারণ রিযকের বন্দোবস্ততো তিনিই করবেন।

মাছের অবস্থা দেখে স্ত্রী বললো, এ মাছ তো খাওয়া দূরের কথা কাটাই তো কঠিন। কারণ মাছটি পঁচে ফুলে ওঠেছে। তারপরও বৃদ্ধা মাছটি নিয়ে কাটতে শুরু করলেন। কাটতেই মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এলো একটি মুক্তা। মুক্তা দেখে স্ত্রী বৃদ্ধকে ডাকলেন। বৃদ্ধ স্ত্রীকে বললেন, দেখো তো মুক্তাটিতে কোনো ছিদ্র আছে কি না? যদি ছিদ্র থাকে তাহলে মনে করতে হবে এটি কারো হারানো মুক্তা। আর ছিদ্র না থাকলে মনে করতে হবে এটি নিখুঁত। আর নিখুঁত মুদ্রার দাম অনেক বেশি। বৃদ্ধ মুক্তাটি নিয়ে একজন স্বর্ণকারের কাছে গেলেন। এমন নিখুঁত মুদ্রা দেখে সাথে সাথে স্বর্ণকার বললো, মুক্তাটি আমাকে দিলে আমি তোমাকে এর দাম হিসেবে ত্রিশহাজার দিরহাম দেবো। তবে তুমি বড় কোনো স্বর্ণকারের কাছে গেলে আরও বেশি দাম পেতে পারো। বৃদ্ধ গেলেন আরও বড় স্বর্ণকারের কাছে। ওই স্বর্ণকার এতো সুন্দর নিশ্চিদ্র মুক্তা দেখে বৃদ্ধকে এর দাম হিসেবে সত্তর হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন। বিশাল মুদ্রার বোঝা মাথায় নিয়ে বৃদ্ধ খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরতেই দরজায় এক ভিখারীর আগমন। হাত পাতলেন সাহায্যের জন্য। হাত পাততেই বৃদ্ধ বলতে লাগলেন ভাই, আমি আজকের আগেও তোমার মতো গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমার ভাগ্য খুলে দিয়েছেন, এই বলে সত্তর হাজার দিরহামকে দুইভাগ করে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম দান করে দিলেন ভিখারীকে।

ভিখারী বললো, হে আল্লাহর প্রিয় বান্দা! আল্লাহর তোমার সম্পদে বারাকাহ দান করুন। আমি আসলে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা। তোমাকে পরীক্ষার জন্য এসেছিলাম। তোমার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।



রক্তাক্ত জুলাই
মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

একাত্তরের গণহত্যা
কষ্ট করে মানছিলাম
সব হানাদার ভীনদেশি।

চব্বিশের এই গণহত্যা
কেমন করে মানবো হায়!
ঘাতকগুলো চীনদেশি?

সেবার শর্তে নিয়োগ নিয়ে
পাখির মতো মারলো মানুষ
জুলাই-আগস্ট রক্ত নদী।

ছব্বিশ বারবার আসবে
সব ঘাতক আর হুকুমদাতার
উচিত বিচার না হয় যদি।

বিক্ষিপ্ত ছড়া
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

০১.
সব ভালো, ভালো নয়
কিছু ভালো মন্দ
সবখানে খুঁজিওনা
খারাপের গন্ধ।

০২.
বেশি করে মধু খেলে
হয় বহুমূত্র
পরিমিত স্বাস্থ্যের
হলো যোগসূত্র।

০৩.
পোষাকের বেশভূষা
বয়ানের মন্ত্রে
মজিওনা সহজেই
মেপো মূল যন্ত্রে।

০৪.
শুটকির ডিব্বাতে
আতরের ঘ্রাণ
কখনো কি পাওয়া যায়?
বলো করে ধ্যান।

০৫.
বিবেকের আদালতে
যদি বুঝো ভালো
সে টুকু গ্রহণ করে
ছড়াও আলো।

সময়ের আক্ষেপ-৮
এস এম মনোয়ার হোসেন

শান্তি-সুখেই আছি
তবুও আরো চাই
মিছে মোহ আশায়
দুঃখটা বাড়াই!

দ্বীন চেতনা নাই
রঙ্গে বেলা যায়
খামখেয়ালি জীবন
ঢঙ্গে কাটে হায়!

গুনাহয় নিমজ্জিত
বারণ করে কে?
নফসের শান্তনা
প্রাণের বন্ধু সে।

এমনি যাবে দিন
আসবে কি বিজয়?
মানবো সহসাই
জীবনের পরাজয়।

সঠিক জীবন পণ
করি যে অনুক্ষণ
মানবীয় গুণহীন
অসাড় এই জীবন।

সৃষ্টিকূলের মূল
আব্দুস সামাদ

তিনি হলেন নূরের নবী
সৃষ্টি কূলের মূল
আঁধার নিদান দূরে গেল
ভাঙ্গল কত ভুল।

তোমার ধ্যানে মশগুল হলে
নূরের ছোঁয়া লাগে
এমন সাধনায় কাটলে রাত
ছয় লতীফা জাগে।

তোমার নূরের ছোঁয়া পেয়ে
ওলীরা ছড়ান আলো
জগতজুড়ে দ্বীনের বাণী
পথ দেখায় ভালো।

নায়েবে নবী দ্বীনের পথে
জীবন বিলিয়ে দেন
দ্বীনের পথে সাধনা করে
রবকে বেছে নেন।

ওরাফা'না লাকা যিকরাক
জামান আহমদ

তুমি নাবী মরু বৃষ্টি
তুমি খোদার সেরা সৃষ্টি
তোমাকে ভেবে হই পেরেশান
দুরুদ পড়ে জিন ইনসান
কত উঁচুতে তোমারী শান
তুলে রেখেছেন আল্লাহ পাক
ওরাফানা লাকা যিকরাক—

তুমি ইয়াসীন, তুমি তোয়া-হা
গুনাহগারের তুমি রাহা—
তুমি হাবীব, খোদা মাহবুব
তোমারি প্রেমে হয়ে আছি বুঁদ—
নামেতে তোমার হয়েছি ফানা
শোনো না দীলে করে ধাক ধাক
ওরাফানা লাকা যিকরাক—

তব কণ্ঠে শোনে কুরআন
কাফিরগণে আনলো ঈমান—
আকাশের চাঁদ তব ইশারায়
পলকে দুই ভাগ হয়ে যায়—
নিথর পাথর যবান খুলে
বলে ওঠে তুমি রাসুলে পাক
ওরাফানা লাকা যিকরাক—

.
তোমার প্রেমে দিওয়ানা এ দীল
ইয়া মুদ্দাসসির ওয়া মুযযাম্মিল
জীবনের চেয়েও তুমি দামী
তোমারী রাহে নেমেছি আমি—
তোমার দীদার পেলে একবার
ঘুরে যাবে এই জীবনের বাঁক
ওরাফানা লাকা যিকরাক—

মা আমিনার ঘরে
নোমান আহমেদ মাছুম

জন্ম তোমার রবিউল আউয়ালে
তাই হাসে চন্দ্র-তাঁরা সৃষ্টির আড়ালে
আসমান জমিন সাজায় ফেরেস্তারা
সৃষ্টির কুল-মাখলুক হয়েছে আত্মহারা
তোমারই আগমনে ধরার পুষ্প বনে
সুবাস ছড়ায় সুগন্ধি আমার তৃপ্ত মনে
জাহান ও জাগরিত হলো তোমার আগমনে
তোমার নূর ছড়ায় ধরার গহীন-বনে

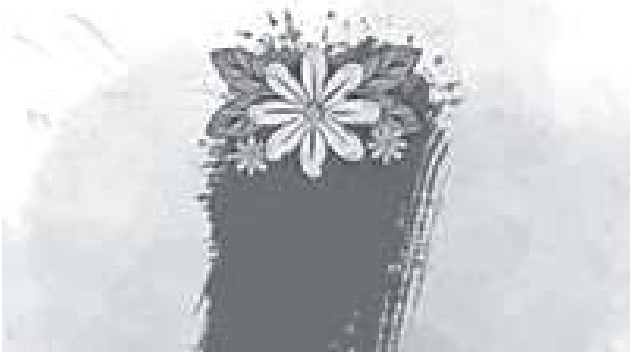
সাহসিকতায় যে নারী ছিলেন খালিদের সমতুল্য

খাওলা বিনতু আজওয়ার (রা.)। আরব্য রমণীদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাবান কবি ও সাহসী যোদ্ধা। সাহসিকতা ও বীরত্বে যাকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাসনামলের শেষ ভাগে তিনি ইন্তিকাল করেন। বনূ আসাদ গোত্রের এই কন্যা রূপে ও গুণে, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অদ্বিতীয়।

খাওলা (রা.) ছিলেন আরবের ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় পরিবারের সন্তান। বীরত্ব ও সাহসিকতায় যুগ যুগ ধরে তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তিনি জ্ঞান ও সমরবিদ্যা চর্চার সুযোগ পান। ইসলাম গ্রহণের পর তার পুরো পরিবার ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে।

বীরত্বের নানা উপাখ্যান : খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.)-এর ভাই দিরার (রা.) বৃহত্তর শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চল জয়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভাইয়ের সঙ্গে তিনিও বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধ তার একটি। এই যুদ্ধের চতুর্থ দিনে বাইজানটাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি একদল নারীর নেতৃত্ব দেন এবং এ যুদ্ধেই তিনি এক গ্রিক যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করে বাইজানটাইন সৈন্যদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

৬৩৪ সালে 'সানিতা উল উকাব' (দামেস্কাস ঘেরাওয়ের সময় সংঘটিত যুদ্ধ) যুদ্ধে তিনি প্রথম প্রতিভার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই দিরার মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি আহত হন এবং বাইজানটাইন বাহিনীর দ্বারা বন্দি হন। এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাঁর বিশেষ টহল দল দিরারকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তার আগেই খাওলা (রা.) মুসলিম বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে পাল্টা আক্রমণ করেন।



সেদিন তিনি এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন যে যতক্ষণ না খালিদ (রা.) এসে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ বহু মুসলিম সৈন্য খাওলা (রা.)-কেই খালিদ ভাবছিলেন। অবশেষে শত্রু বাহিনী পরাজিত এবং পালিয়ে যায়। তিনি তাঁর ভাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। যুদ্ধশেষে খালিদ খাওলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় খুঁজে পান এবং তাঁর পরিচয় জানতে চান। প্রথমে অসম্মতি জানালেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। সেনাপতি শুরাহবিল ইবন হাসানা খাওলা (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদের মতোই যুদ্ধ করে; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সে খালিদ নয়।'

অন্য একটি যুদ্ধে খাওলা (রা.) রোমানদের হাতে বন্দি হন। তাঁকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে শত্রুদের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁকে রোমান সেনাপতির তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তখন তিনি অন্য বন্দি নারীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। নারী বন্দিরা তাঁবুর খুঁটিগুলো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে রোমান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করলেন। আল ওয়াকিদীর মতে, তাঁরা ৩০ জন রোমান সেনাকে হত্যা করেন। এক খ্রিস্টান অধিনায়ক খাওলা (রা.)-কে বন্দি অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তাকেসহ মোট পাঁচজন সেনাকে একাই হত্যা করেন।

উল্লেখ্য, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ২৮ জন নারী সাহাবীর নাম ছিল খাওলা। ফলে খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.)-এর পরিচয় নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের ভেতর কিছুটা মতভিন্নতা আছে। কিন্তু গবেষক আইমান জাগুল আল্লামা ওয়াকিদী, আল্লামা ইবন কাসীর ও আল্লামা জারকানী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেছেন, বীরাঙ্গনা সাহাবী খাওলা বিনতু আজওয়ার ছিলেন সেনাপতি দিরার বিন আজওয়ার (রা.)-এর বোন। আর তিনিই তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র: আল-মার'আতুল আরাবিয়্যা ফী জাহিলিয়্যাতিহা ওয়া ইসলামিহা

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১১৬. صَفَاءٌ (সাফাউন): বাংলা ছফা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, অমলিন।

১১৭. صَبَاحٌ (সাবাহুন): বাংলা সাবাহ/সবা। ভোর, সকাল, প্রত্যুষ, বিহান। যেমন- সবাহী মক্তব।

১১৮. ضِيَافَةٌ (দ্বিয়াফাতুন): বাংলা জিয়াফত। আতিথ্য গ্রহণ করা, আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, দাওয়াতের বৃহৎ আয়োজন।

১১৯. ضَعِيْفٌ (দায়িফুন): বাংলা যয়িফ। দুর্বল, অসহায়, সামর্থহীন, বৃদ্ধ। যেমন- যয়িফ হাদীস, যয়িফ বুড়া।

১২০. ضِدٌّ (দিদ্দুন): বাংলা যিদ। বিপরীত, বিরোধ, হিংসা, একগুঁয়েমি। জিদ থেকে জেদ, জেদি, জেদাজেদি।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি কবিতা লিখতে পারি। কিন্তু আমার কবিতা কি পরওয়ানায় ছাপা হবে? আমি কবিতা কিভাবে পাঠাতে পারি?

মুহাম্মদ হোসাইন

জাঙ্গিরহাট, তারাগঞ্জ, রংপুর

-আন্দালিব ভাই

ধন্যবাদ কবি হোসাইন। তোমাদের লেখা ছাপানোর জন্যই তো এ বিভাগ। তুমি নিয়মাবলি ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা দেখে নিতে পারো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

মাসের প্রথমেই পরওয়ানা হাতে পেয়ে কত যে ভালো লেগেছে তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করি প্রত্যেক সংখ্যায় এরকম মজাদার লেখা উপহার দিবে।

আবু ফারহান

ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, মিরের ময়দান, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমার ভালো লাগাটা আমাদের কাজকে আরো বেগবান করবে। আবাবীল ফৌজ কিন্তু তোমাদেরই বিভাগ। তোমরাও লিখতে পারবে আবাবীল ফৌজে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। পরওয়ানার সাথে আমার নতুন পরিচয় হলো। সংখ্যাটি অসাধারণ হয়েছে। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার লেগেছে। গল্প, কবিতা, শব্দকল্প ও বর্ণকল্প সব মিলিয়ে অসাধারণ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

সানজিদা হক

সিলেট অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। তোমাদের অংশগ্রহণ নিয়মিত হলে অবশ্যই এরকম নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে প্রতি মাসে হাযির হবো তোমাদের কাছে। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমি খুব আপ্লুত। হঠাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মা এনে দিলেন একটি পত্রিকা। চেয়ে দেখি নাম তার পরওয়ানা। সত্যিই আমি পরওয়ানার প্রেমিক হয়ে গেছি। আশা করি সবসময় পরওয়ানা আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে। মাআসসালাম।

ইসমাইল হোসেন তামীম

বায়তুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার সাথে তোমার হৃদ্যতাকে স্বাগত জানাই। পরওয়ানাও তোমাকে সঙ্গী করে নিয়েছে। আশা করি তুমিও পরওয়ানার সাথে সেতুবন্ধন অটুট রাখবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের অনেক নতুন নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে, আনন্দিত হলাম। আশা করি, পরওয়ানা এভাবে সবসময় আমার জ্ঞানরাজ্যের রাজা হয়ে সাথে থাকবে।

হাসিব হাসান মিরান

দরবেশপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মিপুর

-আন্দালিব ভাই

তুমি ঠিক বলেছো প্রিয় মিরান। পরওয়ানা তোমাদের প্রিয় আবাবীল ফৌজকে আরও সাজাতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য প্রয়োজন তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ। তোমার ভালো লেখাটি এখনই পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজের অনুকূলে।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম

সুপ্রিয় বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই। আশা করি খুব ভালো আছো। তোমাদের পড়ালেখার পাশাপাশি পরওয়ানাকে নিয়মিত পড়ে যাচ্ছো আশা করছি। তোমাদের লেখা যেন অব্যাহত থাকে সবসময়।

বন্ধুরা! রবীউস সানী মাসের ১১ তারিখ বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ওফাত দিবস, যা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে ফাতিহা-ই ইয়াজদাহম নামে সুপ্রসিদ্ধ। আব্দুল কাদির জিলানী (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান মনিষী। মায়ের আনুগত্যতা আর সততার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন তা আজও পৃথিবীতে বিরল। ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তার রূহানী ফায়য দান করেন।

বন্ধুরা! দেশের পটপরিবর্তনের কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আসছে পরিবর্তন। তোমার পরীক্ষা পদ্ধতিতে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পরিবর্তিত মূল্যায়ন নির্দেশনা মেনেই তোমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশা করছি। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'চলো আমরা মোমবাতির মতো বাঁচি, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে আলোকিত করি।'

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. আব্দুল কাদির জিলানী (র.) কবে ইন্তিকাল করেন?
২. কত হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়?
৩. বিলকিস কোন রাজ্যের রানি ছিলেন?
৪. ইয়ারমুকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
৫. কত তারিখ থেকে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ১৯৯৭-২০১২
২. আল্লামা আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর
৩. ২১ এপ্রিল ১০৩০ খ্রি.
৪. ৯টি
৫. শেখ সাদী (র.)

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো: রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা,সিলেট # মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম,গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # কামরুল ইসলাম, সঈদপুর বাজার ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা, নবীগঞ্জ # শাহিদা আক্তার, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # ইসরাত জাহান নাবিলা, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী, মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা, টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # আহমেদ হোসেন তামীম, মৌবন আবাসিক এলাকা, সুবহানীঘাট, সিলেট # জুবেল আহমেদ, সফাত আলী সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, কমলগঞ্জ, সিলেট # মো: আব্দুল মান্নান, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

শব্দকল্প

১		২		৩	৪
	■		■		
৬	৭			■	
■	৮		■	৯	
১০			■		■

সূত্র : পাশাপাশি

১। গাউসুল আযম, বড়পীর ৫। অধুনালুপ্ত পারস্যের শাসকের উপাধি ৬। রাত্রি ৮। বনী ইসরাইলের সময়ের বিখ্যাত একটি ময়দান ৯। ক্ষতক ১০। ওলী-আউলিয়াদের কবর।

সূত্র : উপর-নীচ

২। যাত্রীদের সঙ্গের মানপত্র ৩। সঠিক দিক ৪। করুণা, দয়া ৭। ভাইয়ের ছেলে ৯। দুশমন।

গত সংখ্যার সমাধান

ঈ	দে	মী	লা	দু	ন্ন	বী
শা	হ	■	লি	■	■	র
ন	■	স	ত্য	বা	দী	■
■	বা	■	■	■	প	র্দা
বা	রি	প্র	বা	হ	■	■

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. নাছির উদ্দিন তালহা

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

সামিউল ইসলাম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট # মোঃ তানিম আহমদ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জাহেদ আহমদ, রসূলপুর জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, চিলাউড়া, জগন্নাথপুর, সুনাঙ্গঞ্জ # তাওহীদুল ইসলাম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট # তামান্না তামীম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট # আকমল হোসেন, ব্যাংক এশিয়া, টিলাগাঁও বাজার আউটলেট, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আজিদুল আনসার ইমরান, আনিশা কম্পিউটার এন্ড ষ্টেশনারী, টিলাগাঁও,কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সৈয়দ কামরান আলী, টিলাগাঁও, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহরিয়ার সিদ্দিকী আনাস, এমপিপিএম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মাজহারুল ইসলাম, বাদে ভূকশিমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদরাসা, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট।

সুডোকু

	3		4
4			1
			2
2		4	

সমাধানের নিয়ম

এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ২×২ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবার থাকে।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

2	3	1	4
4	1	1	2
3	2	4	1
1	4	2	3

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

আজিম উদ্দিন মাছুম

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ হুছাম উদ্দিন, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, বড়চক, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # তাসনিয়া জান্নাত, কাড়েরা, ছকাপন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আকমল হোসেন, ব্যাংক এশিয়া, টিলাগাঁও বাজার আউটলেট, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আজিদুল আনসার ইমরান, আনিশা কম্পিউটার এন্ড ষ্টেশনারী, টিলাগাঁও, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহরিয়ার সিদ্দিকী আনাস, এমপিপিএম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মাজহারুল ইসলাম, বাদে ভূকশিমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদরাসা, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহমেদ হোসেন তামীম, মৌবন আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, কমলগঞ্জ সরকারী গনমহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো: আব্দুল মান্নান, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অদ্ভুত পৃথিবী

পিরামিড তৈরির রহস্য



বহুভুজের উপর অবস্থিত যে ঘনবস্তুর একটি শীর্ষবিন্দু থাকে এবং যার পার্শ্বতল গুলো প্রত্যেকটি ত্রিভুজাকার তাকে পিরামিড বলে। মিশরে মোট ৭৫ টি পিরামিড আছে। সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হলো গিজার পিরামিড যা খুফু'র পিরামিড হিসেবেও পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর পূর্বে এই গিজার পিরামিডের সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। এর উচ্চতা ৪৮১ ফুট এবং এটি ৭৫৫ বর্গফুট জমির উপর অবস্থিত। প্রায় বিশ বছর ধরে এক লাখ শ্রমিকের দ্বারা এটি তৈরি করা হয়। এই পিরামিডটি তৈরি হয় বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে যার প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ৬০ টন এবং দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতির ছোঁয়ায় বর্তমানে হয়তো এত ভারী পাথর উত্তোলনের যন্ত্র বের হয়েছে। কিন্তু প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে যখন প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া ছিল না সেই সময়ে এত ভারী পাথর দিয়ে কিভাবে এই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল সেই রহস্য আজও মানুষের নিকট অমীমাংসিত।

হাসতে জানি

এক বৃদ্ধ ট্রেনে উঠেছে। উপরোক্ত বগিতে বৃদ্ধ একাই ছিলো। হঠাৎ ১২ জন যুবক চলন্ত ট্রেনের ঐ বগিতে উঠেই চিৎকার করে গান গাইতে লাগলো।

হঠাৎ একটি যুবক বলে উঠলো, চল আমরা ট্রেনের চেইনটা টেনে ট্রেনটাকে থামিয়ে দেই।

২য় যুবকঃ না দোস্ত, লেখা আছে পাঁচ শত টাকা জরিমানা অনাথায় ছয় মাস জেল।

১ম যুবকঃ আমরা একশো টাকা করে চাঁদা তুলি। বারোশো টাকা হবে বাকী সাত শো টাকা দিয়ে লাঞ্চ করবো।

৩য় যুবকঃ দোস্ত, আমরা চেইন টেনে ঐ বুইড়াটাকে দেখিয়ে দিলে পাঁচ শো টাকাও বাঁচলো আবার মজা করাও হলো। আমরা ১২ জনে সাক্ষী দিলে টিটি মেনে যাবে।

বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললোঃ বাবা, তোমরা আমার ছেলের বয়সী। কেনো আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে?

যুবকগুলো বৃদ্ধের অনুরোধ অবজ্ঞা করে চেইনটা টান দিতেই। টিটি চলে এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ কে চেইন টেনেছে?

যুবকগুলো বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললোঃ ঐ চাচা মিয়া টেনেছে।

টিটি বৃদ্ধকে বললোঃ অকারনে চেইন টানলে পাঁচ শত টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাস জেল। যুবকগুলো চিৎকার করে বললোঃ স্যার, বুইড়া অকারনেই টেনেছে। হো হো হো হো হা হা করে যুবকগুলো হাসতে লাগলো ..

বৃদ্ধ একটু দাঁড়িয়ে বললোঃ টিটি সাহেব আমি বিপদে পড়েই চেইন টেনেছি। টিটি বললোঃ কি বিপদ?

বৃদ্ধ বললোঃ ঐ যুবকগুলো আমার গলায় ছুরি ধরে আমার বারো শো টাকা ছিনতাই করেছে। টিটি বললোঃ কি সর্বনাশ?

বৃদ্ধ বললোঃ ১ম যুবকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন ঐ যুবকটির পকেটে টাকা আর ঐ ব্যাগে ছুরি। টিটি পুলিশ কল করে ১২জন যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন বৃদ্ধ তার পাকা চুল/দাড়ি দেখিয়ে যুবকগুলোকে বললোঃ এইগুলো বাতাসে পাকে নাই।

ফয়সল আহমদ
প্রভাষক, স্কলার্সহোম মেজরটলা কলেজ, ইসলামপুর, সিলেট

আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৪৭২. হামিদা মাহান মুনিরা
পিতা: মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গাজীপুর দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: গাজীপুর
ডাক: কুলাউড়া
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৭৩. আহমদ বখত সুফি
পিতা: আহমদ আল কবির চৌধুরী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: হোয়াইটবার্ড একাডেমি
গ্রাম: ভাদেশ্বরী
ডাক: বড়কাপনবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৭৪. দেলওয়ার হোসেন ছামী
পিতা: আনছার আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মঞ্জলাল দারুল হিফয দারুল কিরাত মাদরাসা
গ্রাম: পশ্চিমভাগ
ডাক: পশ্চিমভাগ
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩৪৭৫. মাহফুজ আহমদ
পিতা: শামসুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: আজিমপুর
ডাক: দক্ষিণভাগ
থানা: বড়লেখা
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৭৬. ইউসুফ আদনান
পিতা: রকিবুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: শিবচর
ডাক: কমলাপুর
থানা: মতিঝিল
জেলা: ঢাকা

৩৪৭৭. মাহির হোসাইন
পিতা: আব্দুল মুহিত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লক্ষণাবন্দ হুফফাজুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসা
গ্রাম: লক্ষণাবন্দ
ডাক: চৌধুরীবাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৭৮. মাহফুজ হোসাইন
পিতা: মো. আফতাব উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন
গ্রাম: দৌলতপুর
ডাক: রাখালগঞ্জ
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩৪৭৯. মো: আলী আকবর সোলাইমান
পিতা: মো. আতা মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদরাসা
গ্রাম: দাউদপুর
ডাক: রেঙ্গা দাউদপুর
থানা: মোগলাবাজার
জেলা: সিলেট

৩৪৮০. মিজানুর রহমান কামরান
পিতা: আব্দুল হান্নান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন
গ্রাম: মরিচা
ডাক: আটগ্রাম
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৮১. রবিউল হোসেন হৃদয়
পিতা: ছালেহ আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: পুরান সিরাজপুর
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالى داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

আলিম জামাতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

আল মারওয়ান ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস্

হজ্জ লাইসেন্স নং-১৫১২ | সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট | ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-২৫৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলমান

ওমরাহ্ ইকোনমি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ থেকে ৫-১০ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মসজিদ-এ নববী থেকে ৫-৭ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ওমরাহ্ ভি.আই.পি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ ও মসজিদ-এ নববীর নিকটবর্তী ৪স্টার/৫স্টার হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

ATAB

ভারত এবং বাংলাদেশের যেকোনো এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন (Domestic) টিকেট পাওয়া যায়।

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিস
- সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং
- এয়ার টিকেট
- সৌদি আরবে নিজস্ব মোয়াল্লেম দ্বারা হজ্জ-ওমরাহ্ পরিচালনা করা
- প্রয়োজনে হুইল চেয়ারে যাত্রী বহন
- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান

রশিদ এম্পোরিয়াম (২য় তলা), দরগাহ গেইট, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৩৭৮১৫৫৮০, ০১৬১১৪৮০৪৮০, ০১৭৪৭৫১৫১৫১

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

বৈশিষ্ট্যাবলী

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১১ বছর

ভর্তি চলছে

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

প্রতিবছর
- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ
মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মো. একলাছুর রহমান
সত্ত্বাধিকারী
মোবাইল: ০১৭৩৩-৯৪০৮৪০

মেসার্স

প্রীতি আয়রণ এন্ড স্টীল

এখানে ফ্লেট বার, জেড বার, এঙ্গেল এম.এস শিট
এম.এস পাইপ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মোবাইল দোকান: ০১৭১১-৮৪৭৪৯৫

৭৭২/৫ ঢাকা-সিলেট রোড (বেড়িরপার), মৌলভীবাজার-৩২০০

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬১ লতিফ ট্রাভেলস স্থাপিত : ১৯৬২

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

নকশি

এক্সক্লুসিভ কালেকশন

আর এম সিটি শপিং মল
কুলাউড়া
Nakshi Exclusive

মেসার্স
হাজী আলাউদ্দিন ট্রেডার্স



উত্তর বাজার, কুলাউড়া

মাথা



কুলাউড়া শপিং কমপ্লেক্স (নিচতলা)
কুলাউড়া

প্রোঃ আফজাল হোসেন সাজু ০১৭৪৪-৮১৫০৬৯

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

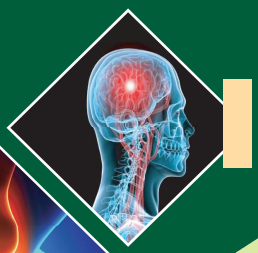
- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে









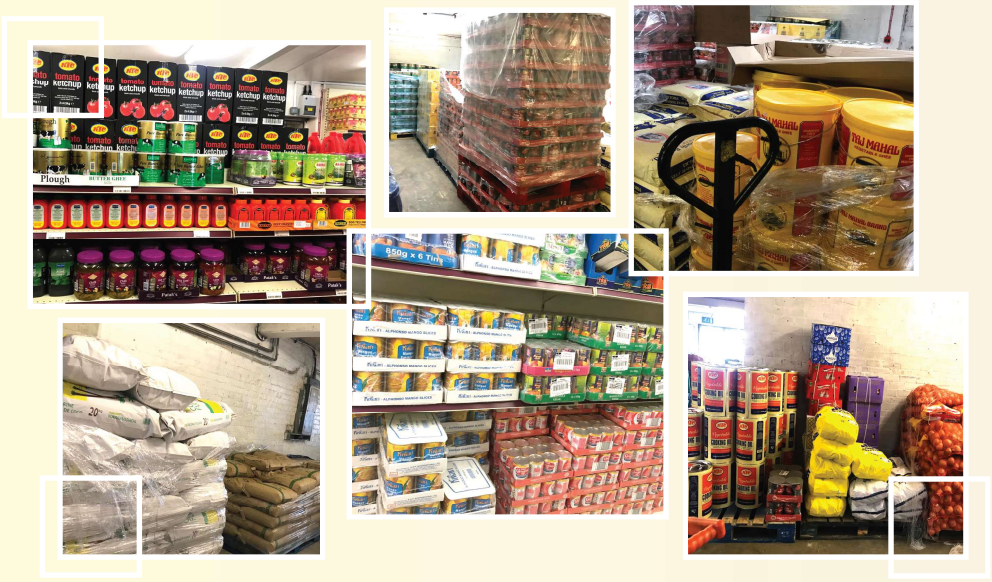
- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127